বাংলাদেশ

বাংলাদেশ

প্রথম বিজয় দিবস বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২

বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী
রাষ্ট্রপ্রধান,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

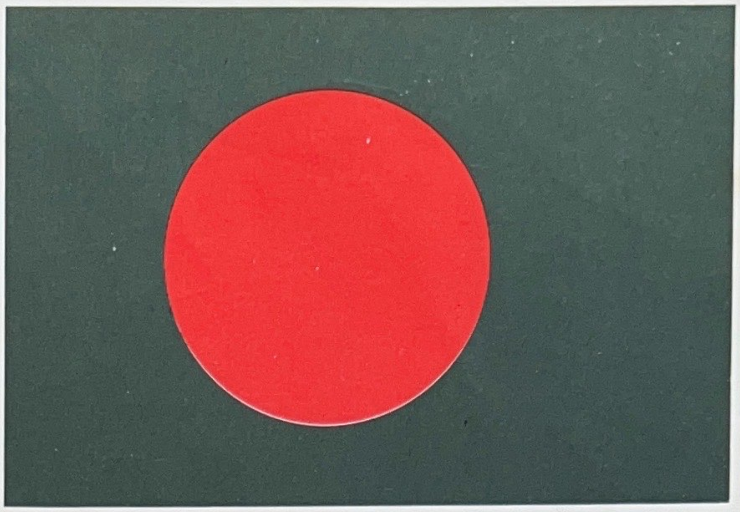

জাতীয় পতাকা

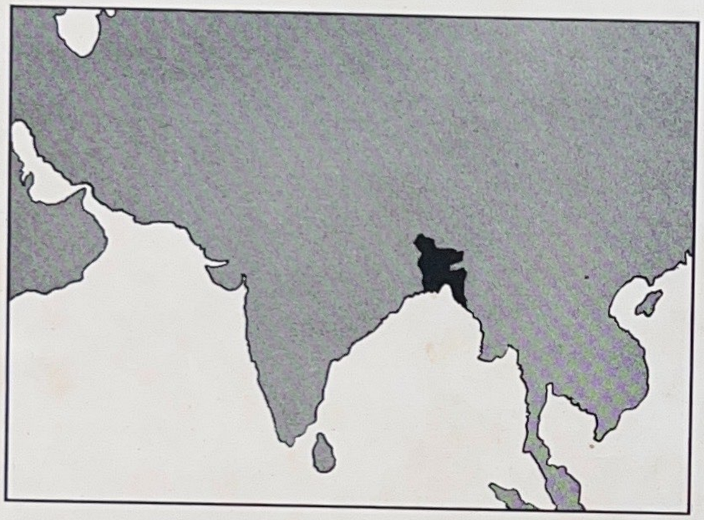

বাংলাদেশ ২০°-৩০′ থেকে ২৬°-৪৫′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° থেকে ৯২°-৫৬′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর ভূখণ্ড ৫৫,১২৬ বর্গমাইল।

সর্বমোট জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি–তিব্বত-মঙ্গোলীয় এবং দ্রাবিড়ীয়-আর্যের সংমিশ্রণ। শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান এবং অবশিষ্ট হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। প্রতি বর্গমাইলে ১,৩৬১ জন লোকের বসতি। বাংলা কথ্যভাষা। ইংরেজীও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। শিক্ষিতের হার শতকরা ২২ জন।

ভৌগোলিক অবস্থানে বাংলাদেশ (১) পার্বত্য এবং উপত্যকাভূমি, (২) উপকূলীয় অঞ্চল এবং (৩) নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে বিভক্ত।

বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হার ৫০″ থেকে ২০০″।
কৃষিকাজই প্রধান অবলম্বন।

সম্পাদনা সংসদ :
সভাপতি : সৈয়দ আলী আহসান
সদস্য : খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা
সদস্য : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
সদস্য : বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
সদস্য : অধ্যাপক নুরুল ইসলাম
সদস্য : মোহাম্মদ জমীর
সদস্য-সচিব : নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা উপসংঘ :
সভাপতি : কামরুল হাসান
সদস্য : কাইয়ুম চৌধুরী
সদস্য : রফিকুন্নবী
সদস্য : কালাম মাহমুদ
সদস্য-সচিব : মহিউদ্দিন আহমদ

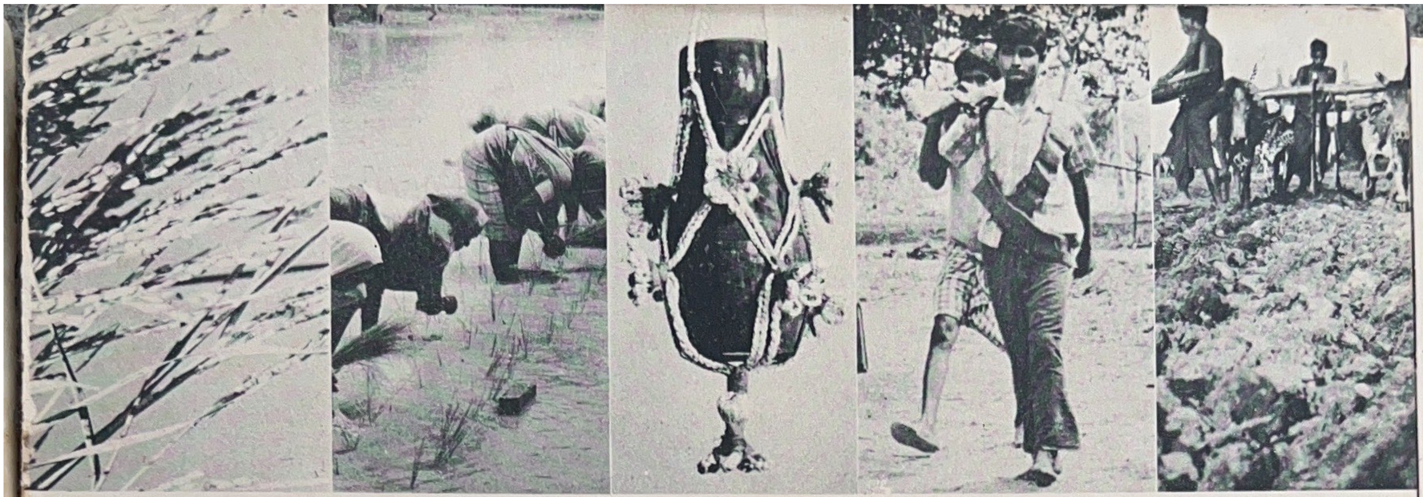

সূচীপত্র

১১ মুখবন্ধঃ সৈয়দ আলী আহসান ... ...
১৩ জাতীয় সঙ্গীত ... ...
১৪ বঙ্গবন্ধুঃ একটি প্রতীক ... ...
১৭ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিঃ ডক্টর সালাহ্উদ্দীন আহমদ
২৫ স্বাধীনতা আন্দোলনের ঈতিহাসঃ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ...
৪৫ বাংলাদেশের উদ্ভবঃ দুর্গা প্রসাদ ধর ... ...
৫৫ জাতীয়তাবাদের ভূমিকাঃ সরদার ফজলুল করিম ... ...
৬৫ বাঙ্গালী সংস্কৃতিঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ...
৭১ স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাঃ ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
৮১ বাঙ্গালী বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবী দলনঃ নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী
৯২ পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনঃ মোহাম্মদ জমীর ... ...
১০৫ বাংলাদেশে গণহত্যা—বিদেশীদের চোখেঃ
সংকলন ও সম্পাদনাঃ খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা ...

পরিশিষ্ট

১১৪ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ... ...
১১৭ বাংলাদেশের মৌলিক পরিচয় ... ...
১২১ বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা ... ...
১২৪ গ্রন্থপঞ্জীঃ সংকলন ও সম্পাদনাঃ মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন ...
১৩১ লেখক ও শিল্পী পরিচিতিঃ

প্রচ্ছদঃ কাইয়ুম চৌধুরী
অঙ্গসজ্জাঃ কালাম মাহমুদ
রফিকুন্ নবী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ডিজাইন সেন্টার
দৈনিক বাংলা
ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা
আমিনুল হক বাদশা
গোলাম মাওলা
কে. এম. আমির

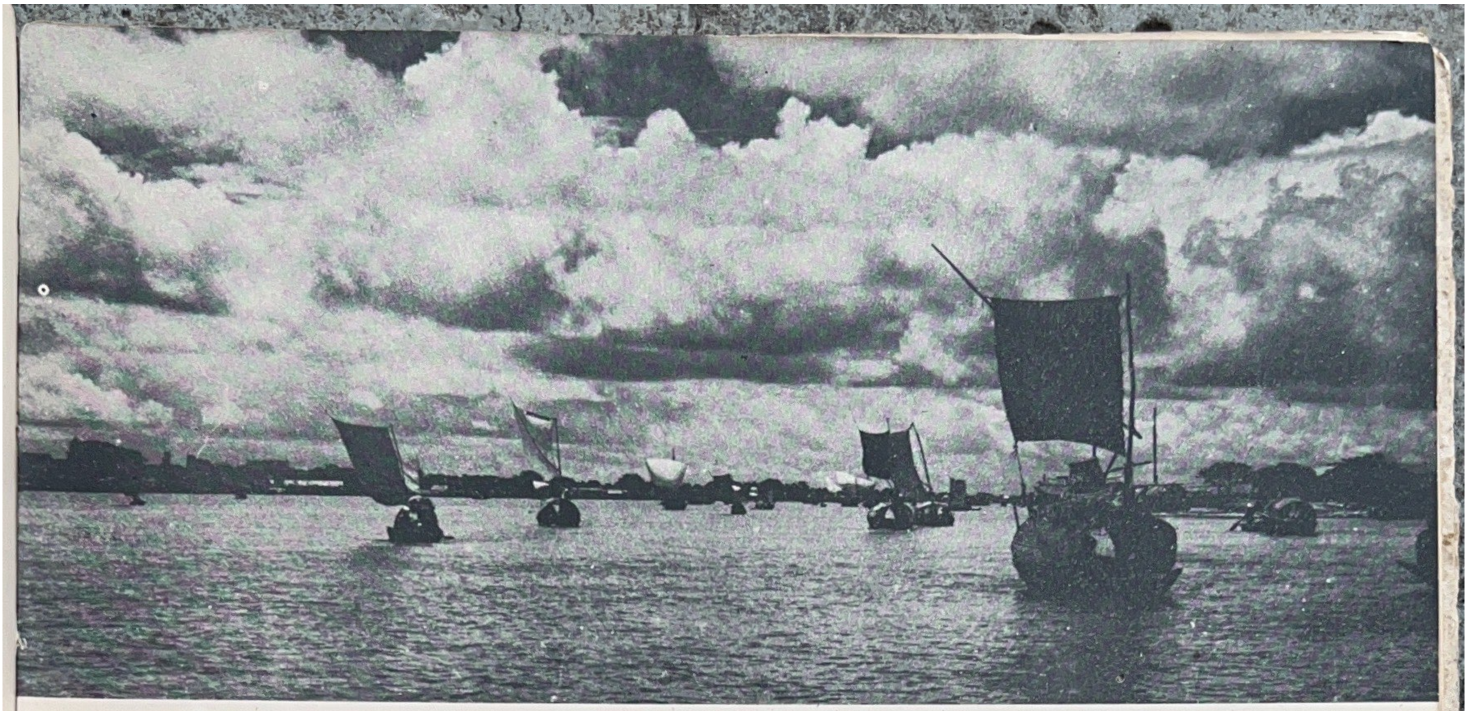

মুখবন্ধ

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের আবির্ভাব কোনও বিস্ময়কর ঘটনা নয়, বরং এটি একটি স্বাভাবিক সত্যের প্রতিষ্ঠা। যে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক অবাস্তবতার মধ্যে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তান একত্রিত ছিল, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে সেই অবাস্তবতা চিরকালের জন্য তিরোহিত হলো। এই অঞ্চলের সামাজিক পরিমন্ডল, ঐতিহাসিক স্মৃতি, নৃতত্ত্বগত অতীত, ভাষা এবং আকাঙ্ক্ষা পাকিস্তান থেকে ভিন্ন ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ধর্মের নামে একটি অস্বাভাবিক বন্ধন নির্মাণ করা হয়েছিল, যে বন্ধন পঁচিশ বছর পর্যন্ত আমাদের পীড়া দিয়েছে, নির্যাতিত করেছে এবং লাঞ্ছিত করেছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির ফলে এই অঞ্চলের জন্য একটি ভৌগোলিক স্বাভাবিকতা নির্মিত হয়েছে, ঐতিহাসিক ক্রমধারা অব্যাহত রয়েছে এবং সামাজিক দিগ্‌বলয় থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখেছি যে, ধর্মকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অতীতে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। করা হয়েছে শুধু মাত্র বিশেষ গোত্রের শাসন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। পাকিস্তানী আমলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ধর্মকে তাঁদের শোষণের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন। মানুষে মানুষে মানুষ হিসেবে যে ঐক্যবন্ধন, যে ঐক্যবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষার সমতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে সে ঐক্যবন্ধনকে পাকিস্তানী শাসকরা ভয় করতেন। তাই তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন নেতিবাচক ব্যবধানের উপর, যার ফলে একটি বিরোধকে চিরস্থায়ী মূল্য দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দুই বিরোধী আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য শাসনযন্ত্র নির্মাণ করা হয়েছিল। বাঙ্গালীদের পক্ষে আবেগ ভুলে গিয়ে, অনুভূতিকে হারিয়ে এবং আপন অস্তিত্বের শেষ লিপি মুছে দিয়ে শুধু একটি অবধারিত ধর্মীয় নিয়মে পাকিস্তানে সচল থাকা সম্ভবপর হয়নি। তারা প্রতিবাদ করেছে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, কখনও-প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছে, কিন্তু আপন দাবী কখনও পরিত্যাগ করেনি।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা বাঙ্গালীরা চিন্তায় ও কর্মজগতে একত্রিত হলাম এবং বাংলাদেশের প্রকৃতি, ঘটনা, ইতিহাস এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বাস করবার অধিকার দাবী করলাম। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তাদের নিষ্ঠুর শোষণ-নিষ্ঠায়, বিকৃত স্বার্থপরতায় আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে জীবনের যথাতথ্যকে অস্বীকার করে তারা এক অস্বাভাবিক জীবন নির্মাণ করতে চেয়েছিল, যেখানে জীবনের অঙ্গীকার ছিল না।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিও গঠিত হয়েছে। আমরা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদের স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রকে গড়ে তুলবার সুযোগ পেয়েছি। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের দেশ শত্রু-কবল মুক্ত হলো, আমরা একটি বিশেষ মুহূর্তকে আবিষ্কার করেছি, যে মুহূর্তে আমরা পুরোনো বন্ধনদশা থেকে নতুন সূর্যোদয়ে উপস্থিত হয়েছি, যখন একটি যুগ শেষ হচ্ছে এবং বহুদিন পর্যন্ত রুদ্ধবাক একটি জাতির আত্মা আপন কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছে। আজকের দিনে আমরা দুর্ভাগ্যের সময়সীমা অতিক্রম করে নিজেকে আবিষ্কার করবো। আজকের উৎসব নতুন পদক্ষেপের উৎসব, নতুন সুযোগের উন্মোচনের উৎসব এবং অপেক্ষমাণ ভবিষ্যতের জয়ের উৎসব।

ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭২

সৈয়দ আলী আহসান

মাছ ধরার জাল

জাতীয় সঙ্গীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

বঙ্গবন্ধু-

একটি প্রতীক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—এক অপরূপ মোহিনী শক্তি এই নামে। প্রতিটি বাঙ্গালীর মনের মুকুরে ভেসে উঠে রূপকথার এক বীর নায়কের প্রতিচ্ছবি। ভেসে উঠে বাংলার প্রতিটি নির্যাতিত মানুষের প্রতি দরদ ও ভালোবাসাসিক্ত একটি মানুষের চেহারা। যে অসাধারণ ধৈর্য, সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে অসংখ্য অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী শাসক ও শোষক চক্রকে রুখে দাঁড়ান তার তুলনা কেবলমাত্র রূপকথা ও পৌরাণিক মহাকাব্যের অতিমানবিক নায়কদের মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রায় এক যুগব্যাপী কারাজীবনে তিনি অন্ততপক্ষে দু'বার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ান। কিন্তু কখনো মুহূর্তের জন্যে এতটুকু দমেন নি, টলেন নি। সব রকমের দুঃখকষ্ট এবং বিপদের মধ্যেও তাঁর চেহারায় দেখা যেতো বিজয়ীর হাসি। যে অপূর্ব স্থৈর্য ও নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়ে তিনি তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোকাবেলা করেন তা কেউ কোনদিন ভুলবে না। পাকিস্তানী শাসক চক্র তাঁর জনগণের প্রতি কিছুটা সংযত আচরণ করবে, শুধুমাত্র একথা বিবেচনা করেই ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তিনি কিভাবে গ্রেফতার বরণ করেন তা সমগ্র বিশ্ব জানে। কিন্তু কার্যত তা হয় নি। প্রতিটি ব্যাপারেই দেখা গেছে যে শেষ পর্যন্ত তিনি বিজয়ীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এসব সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাঁর অদম্য সাহস, ইস্পাত-কঠোর সঙ্কল্প, আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং তাঁর জনগণের ঐক্য ও সংহতিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

বাংলার মানুষ তাঁকে "আমার নেতা, তোমার নেতা—শেখ মুজিব", "মুজিব ভাই" এবং সর্বোপরি "বঙ্গবন্ধু" প্রভৃতি যে নামেই আখ্যায়িত করুক, তিনি প্রতিটি বাঙ্গালী হৃদয়ের মণিকোঠায় সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি রূপকথার জীবন্ত নায়ক, বাঙ্গালী সত্তার মূর্ত প্রতীক এবং বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভাবাবেগের উৎস।

একথা সত্য যে, বিগত পঁচিশ বছরের বিপ্লবী অগ্নি-পুরুষ বর্তমানে সরকারী ক্ষমতার পুরোভাগে রয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে তিনি কেবল প্রধানমন্ত্রীই নন। তিনি তাঁর জনগণের সর্বপ্রকার ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। কারণ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধ শক্তি তিনিই গড়ে তোলেন। কর্মজীবনে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও গতিশীল নেতৃত্বে সবচাইতে বড়ো অবদান হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এটাই তাঁর কর্মজীবনের মূল কথা। এটাই তাঁকে ও তাঁর জনগণকে গৌরবের বিজয়মাল্যে ভূষিত করেছে।

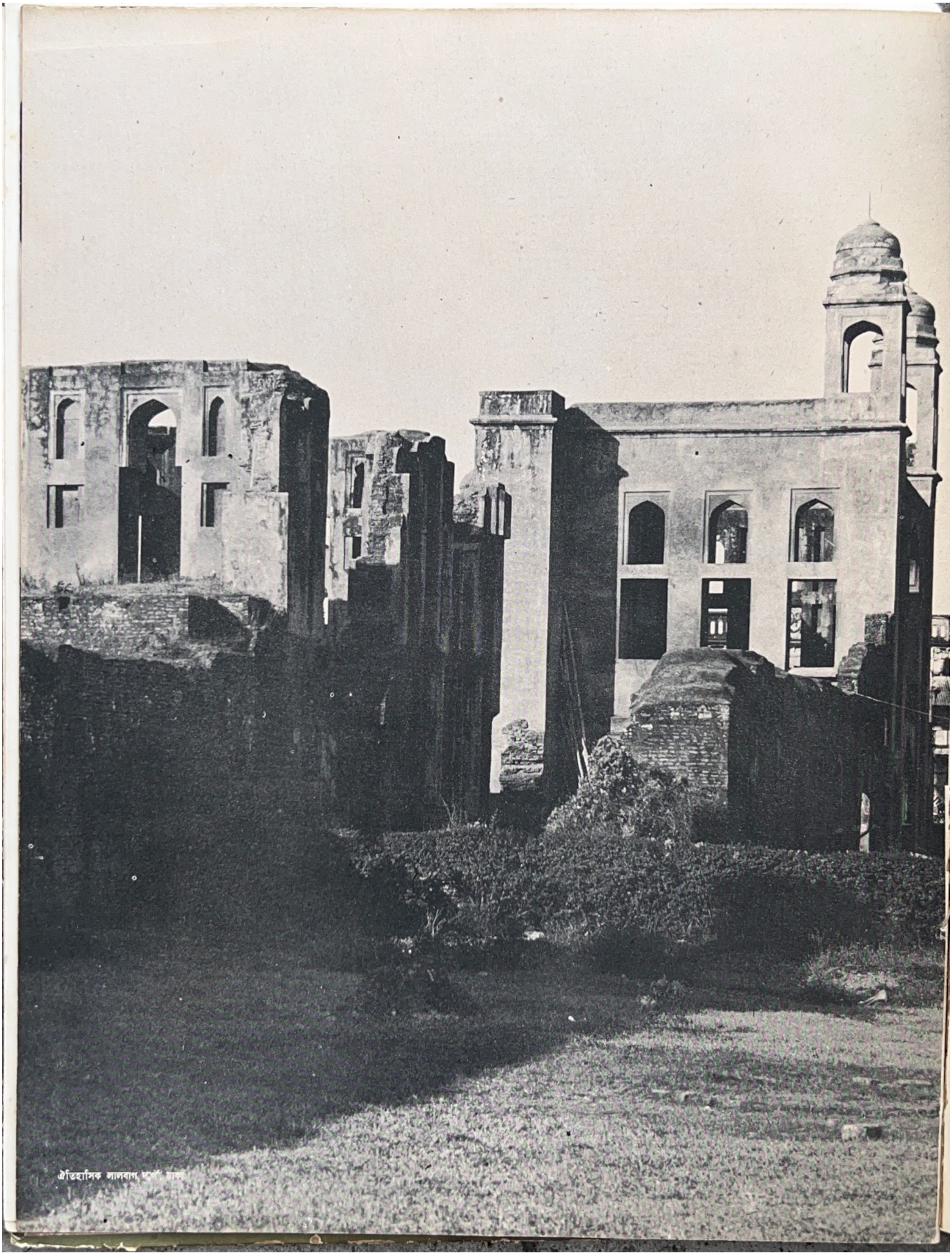

ঐতিহাসিক লালবাগ দুর্গ, ঢাকা

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি

ডক্টর সালাহউদ্দীন আহমদ

ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ বেয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। দক্ষিণ এশীয় এই উপমহাদেশের এতদঞ্চলের জনগোষ্ঠী সুপ্রাচীন কাল থেকেই তাদের একটি পৃথক সত্তা অক্ষুণ্ন রেখেছে এবং বাইরের কোন কেন্দ্রীয় শক্তির আধিপত্য মেনে নেবার ব্যাপারে বরাবর অনীহা প্রদর্শন করে এসেছে। বৃটিশ শাসন আমলে বঙ্গদেশেই প্রথম জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং কালক্রমে তারই পরিণতিতে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে প্রধানতঃ বাংলার জনৈক মুসলিম নেতা ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র উদ্যোগেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু এই দলের নেতৃত্ব সব সময় এমন সব লোকদের কুক্ষিগত থাকে যাঁদের অধিকাংশ ছিলেন বৃটিশ রাজের অনুগত সমর্থক এবং রক্ষণশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিভূ। মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার সুযোগে জনগণের ধর্মীয় ভাবাবেগ ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মুসলিম জনগণের সমর্থন লাভের প্রয়াস পেতেন। ১৯৪০ সালে যখন মুসলিম লীগ পাকিস্তান-দাবী উত্থাপন করে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ মুসলমান থাকায় তারাও এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। তাদের বিশ্বাস ছিল তারা যদি একটি পৃথক আবাসভূমি লাভ করে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বোত্তম পূরণ সম্ভব হবে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের সমবায়ে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবীতে গৃহীত যে প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত হয়ে এসেছে, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সেটিও উত্থাপন করেন বাংলার অপর একজন বিখ্যাত মুসলিম নেতা এ, কে, ফজলুল হক।

বৃটিশ শাসন আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক জীবনের প্রধান উপপাদ্য হয়ে দাঁড়ায় হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই

প্রাচীন টেরাকোটার কাজ
ময়নামতিতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি

মুসলিম রাজনৈতিক আচার-আচরণে যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদ আত্মপ্রকাশ লাভ করতে থাকে, সেটা ছিল এক ক্রান্তিকালের বিশেষ ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসংখ্যাই মুসলমান, আর দীর্ঘকাল থেকেই এরা এদের সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে একটি সমস্যায় ভুগছিলেন। একদিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা ধর্মীয় বন্ধনের কারণে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন; অপর দিকে তারা তাদের দেশজ সাংস্কৃতিক পটভূমি অক্ষুণ্ন রেখে স্থানীয় অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা বোধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী মুসলমানদের এই বিচ্ছিন্নতাই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের বিশিষ্ট সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতির অধিকারী একটি একক সম্প্রদায়রূপে গণ্য করবার প্রবণতা প্রায়শঃই বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগ সরকার এই যুক্তিতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করবার প্রয়াস পান যে, যেহেতু উর্দু ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের 'জাতীয়' ভাষা, সুতরাং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার দাবী একমাত্র এরই রয়েছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এমন কি ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকার জনসমাবেশসমূহে মিঃ জিন্নাহ্ বিশেষ জোরের সঙ্গে যেসব যুক্তির অবতারণা করেন, যেমন, পাকিস্তান এক অখণ্ড রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানীরা এক অবিভাজ্য জাতি বিধায় রাষ্ট্রভাষা মাত্র একটাই হতে পারে আর সেটা হওয়া উচিত উর্দু—এসব যুক্তি বাঙ্গালী মুসলমান, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের তুমুল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তাঁরা দাবী করলেন, বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, কারণ পাকিস্তানের অধিকাংশ জনসংখ্যা পূর্ববঙ্গে বাস করে এবং তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। ছাত্র আন্দোলনকে হিন্দু বা কম্যুনিষ্ট-অনুপ্রাণিত বলে চিত্রিত করবার জন্য মুসলিম লীগ সরকার যে প্রচেষ্টা চালান তা সফল হয় নি। অবশেষে উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণার দাবী সরকার মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই ছাত্র আন্দোলনের ফলে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবীতে একটি জোরদার আঞ্চলিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এর জোয়ার মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯৫৮ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যে দুই দুই বার সামরিক আইন জারী করেও এই আন্দোলন প্রতিহত করা সম্ভব হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ, আমলা, পুঁজিপতি ও সমর-নায়কদের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক ভাবধারাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে। এই অনুভূতি থেকেই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়।

যে আন্দোলন থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি, সেটি কোন ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। সেটি ছিল স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি রাজনৈতিক আন্দো-

প্রাচীন টেরাকোটার কাজ

ময়নামতিতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি

মুসলিম রাজনৈতিক আচার-আচরণে যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদ আত্মপ্রকাশ লাভ করতে থাকে, সেটা ছিল এক ক্রান্তিকালের বিশেষ ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসংখ্যাই মুসলমান, আর দীর্ঘকাল থেকেই এরা এদের সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে একটি সমস্যায় ভুগছিলেন। একদিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা ধর্মীয় বন্ধনের কারণে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন; অপর দিকে তারা তাদের দেশজ সাংস্কৃতিক পটভূমি অক্ষুণ্ন রেখে স্থানীয় অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা বোধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী মুসলমানদের এই বিচ্ছিন্নতাই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের বিশিষ্ট সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতির অধিকারী একটি একক সম্প্রদায়রূপে গণ্য করবার প্রবণতা প্রায়শঃই বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগ সরকার এই যুক্তিতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করবার প্রয়াস পান যে, যেহেতু উর্দু ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের 'জাতীয়' ভাষা, সুতরাং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার দাবী একমাত্র এরই রয়েছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এমন কি ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকার জনসমাবেশসমূহে মিঃ জিন্নাহ্ বিশেষ জোরের সঙ্গে যেসব যুক্তির অবতারণা করেন, যেমন, পাকিস্তান এক অখণ্ড রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানীরা এক অবিভাজ্য জাতি বিধায় রাষ্ট্রভাষা মাত্র একটাই হতে পারে আর সেটা হওয়া উচিত উর্দু—এসব যুক্তি বাঙ্গালী মুসলমান, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের তুমুল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তাঁরা দাবী করলেন, বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, কারণ পাকিস্তানের অধিকাংশ জনসংখ্যা পূর্ববঙ্গে বাস করে এবং তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। ছাত্র আন্দোলনকে হিন্দু বা কমুনিষ্ট-অনুপ্রাণিত বলে চিত্রিত করবার জন্য মুসলিম লীগ সরকার যে প্রচেষ্টা চালান তা সফল হয় নি। অবশেষে উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণার দাবী সরকার মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই ছাত্র আন্দোলনের ফলে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবীতে একটি জোরদার আঞ্চলিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এর জোয়ার মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯৫৮ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যে দুই দুই বার সামরিক আইন জারী করেও এই আন্দোলন প্রতিহত করা সম্ভব হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ, আমলা, পুঁজিপতি ও সমর-নায়কদের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক ভাবধারাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে। এই অনুভূতি থেকেই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়।

যে আন্দোলন থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি, সেটি কোন ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। সেটি ছিল স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি রাজনৈতিক আন্দো-

লন। হিন্দুদের রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হবে এই আশংকা আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যদিও ঐতিহ্যিক ইসলামে রাজনীতি ও ধর্ম অবিভাজ্য, আধুনিক মুসলিম সমাজ সম্পর্কে একথা সত্য নয়। পাকিস্তান আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল, ধর্মীয় নয় (যদিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছিল), এবং এতে যে ইসলামী ধর্মীয় রাষ্ট্র বা পুরোহিততন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল না তা স্পষ্ট বুঝা যায় এর নেতৃত্বের চরিত্র থেকেই। ঐতিহ্যিক ইসলামের প্রতি এর নেতৃবৃন্দের সামান্য সংখ্যকেরই একটি গভীর ব্যক্তিগত আকর্ষণ ছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই মজলিস-ই-আহ্রার, জমিয়ত-উল-উলামা-ই-হিন্দ প্রভৃতি গোঁড়া মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলিম লীগকে সমর্থন করত না। তাদের যুক্তি ছিল এর নেতৃত্ব যথাযথ ইসলামী নয়। এইসব গোঁড়া মুসলিম ধর্মবিদদের বিরোধিতা সত্ত্বেও (স্মরণ করা যেতে পারে যে, সমস্ত মুসলিম ধর্মবিদই মুসলিম লীগের বিরোধী ছিলেন না), মুসলিম লীগ মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের এবং তাদের মাধ্যমে মুসলিম গণসমাজের সমর্থন লাভে সমর্থ হয়। তাদের জন্য পাকিস্তান ছিল বহুমুখী উন্নতির একটি সুযোগ-বিশেষ।

অন্যদিকে নিছক বাস্তব বিবেচনার খাতিরেও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ধর্মের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপে সক্ষম হয় নি। শিয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায় থেকেই মুসলিম লীগের নেতৃত্ব এসেছিল। একটি ধর্মীয় বা ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী একবার উত্থাপিত হলেই যে প্রশ্নটি পরবর্তী মুহূর্তেই উঠত, রাষ্ট্রে কোন্ সম্প্রদায়ের ইসলাম আসীন হবে? তাছাড়া যেহেতু নেতৃবৃন্দ নিজেরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে গোঁড়া ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন না, তাঁরা যে রাষ্ট্র দাবী করতেন তাতে কী করে ইসলামী আইন ও ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তনের জন্য তাঁরা সুপারিশ করবেন? পূর্বেই বলা হয়েছে, নেতৃবৃন্দ এসেছিলেন বিভিন্ন উপসম্প্রদায়গত পটভূমি থেকে। আগা খাঁ বহু বছর ধরে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ ইসমাইলিয়া শিয়াদের প্রধান। জিন্নাহ্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, অথচ তিনিও ছিলেন পশ্চিম ভারতের একটি ক্ষুদ্র শিয়া উপসম্প্রদায় বোহরা সমাজের অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তানের দার্শনিক-কবি স্যার মোহাম্মদ ইকবাল গোঁড়া সুন্নী সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনিও তার গোঁড়ামী-বর্জিত ধর্মীয় মতবাদের কারণে প্রাচীনপন্থী ইসলামের ধ্বজাধারীদের নিকট জনপ্রিয় ছিলেন না।

উপরন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল অবধি যে পাকিস্তানের ধারণা ক্রমশঃ গড়ে ওঠে তাতে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় পাকিস্তানে প্রচুর-সংখ্যক অমুসলমান এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে বাধ্য। যদি পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হয় তবে অমুসলমানদের অবস্থা জিম্মী তথা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত হবে। অথচ এইসব লোকের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ত্রিশেরও অধিক হত। এই অবস্থা অমুসলমানগণ মেনে নেবে সেটা আশা করা সুকঠিন ছিল। একথা সত্য যে, মুসলিম লীগ নেতারা মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে 'ইসলামী সামাজিক সুবিচার', 'ইসলামী সমাজতন্ত্র', 'ইসলামী গণতন্ত্র' প্রভৃতির কথা বলতেন—কিন্তু তাঁরা কখনও এসব বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে সাহসী হন নি; এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, তাঁরা কখনও সুস্পষ্টভাবে একথা বলেন নি যে, পাকিস্তানের আইন-কানুন ইসলামের অনুশাসন অনুসারেই রচিত হবে। মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মতই তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সপ্তম শতাব্দীর আরব ভূখণ্ডে যে ইসলামী জীবন-ধারা গড়ে উঠেছিল তার থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। এই বিচ্যুতির প্রতিক্রিয়ায় মাঝে মাঝে ভারতীয় ইসলামে পুনরুজ্জীবনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল নানা আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত উত্তর ভারতের তরিকা-ই-মুহম্মদিয়া অথবা ওয়াহাবী আন্দোলন এবং বাংলাদেশের ফরায়েজী আন্দোলন। উনিশ শতকে এইসব আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে এবং এসবের প্রতিধ্বনি সাম্প্রতিক কালেও শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসব আন্দোলন ভারতীয় মুসলিম সমাজের গভীরে কখনও প্রবেশলাভ করতে সক্ষম হয় নি। পাকিস্তান দাবী একটি মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, ইসলামী ধর্মীয় আন্দোলনের নয়।

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চে লাহোরে মুসলিম লীগ অধিবেশনে গৃহীত যে বিখ্যাত প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি দাবী করা হয় তার মধ্যে কোথাও 'ইসলাম' শব্দ ছিল না। মুসলিম লীগের প্রস্তাবে বলা হয়ঃ "নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, নিম্নোক্ত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই দেশের জন্য কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না বা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, অর্থাৎ ভৌগোলিক দিক থেকে সন্নিহিত এলাকাসমূহের সীমানির্দেশ করে এমন সব অঞ্চল গঠন করতে হবে এবং এমনভাবে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস সাধন করতে

হবে যার ফলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলসমূহে যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যাগুরু, সেই সব অঞ্চলে এমন সব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে যার মৌলিক অংশসমূহের প্রতিটি স্বশাসিত ও সার্বভৌম হয়।"

পাকিস্তান সৃষ্টির পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গভর্ণর-জেনারেল রূপে ১৯৪৭ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতির ভাষণে একটি নীতি-বিষয়ক ভাষণ দান করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জোর দিয়ে বলেন যে, পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। পাকিস্তানে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেনঃ

> "আপনারা স্বাধীন; পাকিস্তান রাষ্ট্রে আপনারা স্বাধীনভাবে আপনাদের মন্দিরে বা মসজিদে বা অন্য যেকোন উপাসনালয়ে যেতে পারেন। আপনারা যেকোন ধর্ম, গোত্র বা মতাদর্শের অনুসারী হতে পারেন, রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ··· আমরা এই মৌলিক নীতি নিয়ে যাত্রা শুরু করছি যে, আমরা সকলেই এক রাষ্ট্রের নাগরিক, সমান নাগরিক।
>
> "এখন আমি মনে করি আমাদের সামনে এই আদর্শ রাখতে হবে এবং কালক্রমে আপনারা দেখতে পাবেন, হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান মুসলমান থাকবে না, ধর্মীয় অর্থে নয়, কারণ সেটা প্রতিটি লোকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে।"

হয়ত জিন্নাহ্‌র কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, পাকিস্তানকে যদি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হয়, এর ভিত্তি হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে দেয়া সঙ্গত হবে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জিন্নাহ্‌ তাঁর আদর্শের বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেন নি। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু ধর্মনিরপেক্ষতার এই গতিধারাকে রুদ্ধ করে দেয়। নবজাত রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলার ব্যাপারে জিন্নাহ্‌র উত্তরসূরীগণ উপযুক্ত প্রমাণিত হন নি। পাকিস্তানের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ফলে বিশেষতঃ ভারতের সীমান্তস্থ প্রদেশসমূহ হতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তানে আসতে শুরু করেছিল। এদের পুনর্বাসন একটি দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এইসব শরণার্থীদের স্থানীয় জনগণের সঙ্গে একত্রীকৃত করে দেয়াও ছিল একটি সমস্যা। সন্দেহ, ঈর্ষা ও মনোমালিন্য দানা বেঁধে উঠতে লাগল, যা সরকারী মহলেও প্রভাব বিস্তার করল। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন এবং গঠনমূলক ধারায় চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, পাকিস্তান অর্জিত হলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এমন কি মুসলমানদের শিক্ষিত মহলেও এমনি একটা আত্মতুষ্টির ধারণা জন্মলাভ করেছিল। রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অভাবে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজেদের সুবিধা, মেধাগত সীমাবদ্ধতা এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের আলোকে পাকিস্তানের ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছিলেন।

এভাবেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন কোন্‌ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কে পন্থা নির্দেশে ব্যর্থ হলেন, তখন ধর্মনেতাগণ তাঁদের নিজেদের ব্যাখ্যা নিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁরা যুক্তি দিলেন পাকিস্তান যেহেতু মুসলমানদের আন্দোলনের ফল, সুতরাং এখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কর্তব্য। ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতার দোহাই দিয়ে উলেমাগণ পাকিস্তান সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি নতুন অর্থ এবং ধারণা সৃষ্টি করলেন। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতিবিদগণ সুস্পষ্টভাবে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার উদগ্র তাগিদে তারা উলেমাদের সাথে আপোষ করতে দ্বিধা করেন নি। ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চে করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদে গৃহীত আদর্শ প্রস্তাব হতে উলেমাদের এই প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এই প্রস্তাবে পাকিস্তানকে এমন একটি রাষ্ট্ররূপে উল্লেখ করা হয় "যেখানে পবিত্র কোরান ও সুন্নায় বর্ণিত ইসলামের শিক্ষা ও অনুশাসন অনুসারে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করা হবে।" ১৯৫৬ সালের যে শাসনতন্ত্রে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষিত হয় সেখানে এই প্রস্তাবটি সংবিধানের প্রস্তাবনা-অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়।

পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকে এখানে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস বরাবর ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচী অনুসরণ করে এসেছে। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় কতিপয় নেতাও মুসলমান ছিলেন। কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্যও ছিল সুস্পষ্ট। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শে কংগ্রেস আস্থাবান ছিল। ফলে

স্বাধীনতার স্বল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেস অনায়াসে একটি সংবিধান প্রণয়নে সক্ষম হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র একটি সংবিধান রচনা করতেই ব্যর্থ হন নি (প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৬ সালের পূর্বে কোন সংবিধান রচনাই সম্ভব হয়নি এবং ১৯৫৮ সালে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করার ফলে সেটিও বাতিল হয়ে যায়); তারা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ভিত্তিও নস্যাৎ করে দেন। গভর্ণর-জেনারেল পদ গ্রহণ করে জিন্নাহ্ একটি বিপজ্জনক নজীর স্থাপন করেন। গভর্ণর-জেনারেল বা প্রেসিডেণ্টের একটি শাসনতান্ত্রিক প্রধান থাকার কথা এবং ভারতে অবস্থা তাই-ই ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে জিন্নাহ্ গভর্ণর-জেনারেল হওয়ায় এই পদটি প্রধানমন্ত্রী পদের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত প্রস্তাবে গভর্ণর-জেনারেলরূপে জিন্নাহ্ প্রায় স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাই প্রয়োগ করতেন। একটা লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল, পাকিস্তানে রাজনীতি ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক ছিল বলে কোন পদের গুরুত্বে হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর। এভাবেই জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী থাকায় এই পদ গভর্ণর-জেনারেলের পদ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন এবং গোলাম মোহাম্মদ হন গভর্ণর-জেনারেল। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন একজন বেসামরিক আমলা। জিন্নাহ্ তাঁকে অর্থ-মন্ত্রীরূপে কেবিনেটে স্থান দেন। সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধিকারী গোলাম মোহাম্মদ জিন্নাহ্‌র দৃষ্টান্ত অনুসরণে কাজ করে চলেন এবং নাজিমুদ্দিনের দুর্বল ব্যক্তিত্বের সুযোগ নিয়ে সুচতুরভাবে নিজস্ব ক্ষমতা গড়ে তুলতে প্রয়াস পান। যেহেতু তাঁর কোন রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না, তিনি অতি-মাত্রায় সিভিল সার্ভিস এবং পাঞ্জাবী-প্রভাবিত সেনাবাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়েন। পাকিস্তানে রাজনীতি ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে পর্যবসিত হয়েছিল। শাসকচক্রের অধিকাংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী; তারা এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলামের নাম ব্যবহার করত। এই সময়কাল ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা হয়েছে! ফলে বাঙ্গালীদের মধ্যে একটি বঞ্চনা ও নৈরাশ্যের মনোভাব গড়ে উঠতে লাগল। এই মনোভাবই কালক্রমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। কিন্তু এই উপলব্ধি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা সম্পর্কে একটি নতুন চেতনা ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের সময়েই গড়ে উঠতে থাকে। পুরোনো মুসলিম লীগের দ্বিধা-বিভক্তি ও আওয়ামী লীগের জন্ম পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত করে। রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসছিল এবং রাজনীতির গতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এর কিছু-কাল পরেই যুব লীগ, গণতন্ত্রী দল প্রভৃতি ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনসমূহ গড়ে ওঠে। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ তার নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দেয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ দল পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাক্কারজনকভাবে পরাজয় বরণ করে। আওয়ামী লীগ ছাড়াও কৃষক শ্রমিক পার্টী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টী নামে আরও দুটি ধর্ম-নিরপেক্ষ দলের জন্ম হয়। পাকিস্তানে কম্যুনিষ্ট পার্টী নিষিদ্ধ থাকলেও এর গোপন তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সেনাবাহিনী আমলাতন্ত্র ও বৃহৎ পুঁজির প্রভাবাধীন পাকিস্তানী শাসকচক্র এসব নতুন ঘটনাবলীতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অপসারণ, ১৯৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট গঠন এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী—এসব ছিল দেশে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে প্রতিহত করবার একই চক্রান্তের বিভিন্ন দিক। ১৯৬২ সালে প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খান একটি একনায়কত্ব-মূলক সংবিধান জনগণের উপর চাপিয়ে দেন এবং তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এটা কার্যতঃ ছিল গণতান্ত্রিক খোলসে একটি স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা। জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা প্রায় ছিল না বললেই চলে; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চরমভাবে খর্ব করা হয় এবং শাসন বিভাগকে করা হয় নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। বাঙ্গালীরা অনুধাবন করতে শুরু করল যে, একমাত্র বয়স্ক ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই তারা দেশের শাসন-ব্যবস্থায় যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

১৯৬৬ সালের মধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের গতিশীল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ 'পূর্ব পাকিস্তানের' জনগণের জাতীয় প্লাটফর্মে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ-প্রণীত ছয়-দফা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীর নিশ্চয়তা দান করেছিল।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করল যে, জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্মসূচীর পেছনে রয়েছে। মুসলিম লীগ এবং জামাতে ইসলামীর ন্যায় ধর্মীয় দলসমূহ নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়।

স্বাধীনতার স্বল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেস অনায়াসে একটি সংবিধান প্রণয়নে সক্ষম হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র একটি সংবিধান রচনা করতেই ব্যর্থ হন নি (প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৬ সালের পূর্বে কোন সংবিধান রচনাই সম্ভব হয়নি এবং ১৯৫৮ সালে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করার ফলে সেটিও বাতিল হয়ে যায়); তারা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ভিত্তিও নস্যাৎ করে দেন। গভর্ণর-জেনারেল পদ গ্রহণ করে জিন্নাহ্ একটি বিপজ্জনক নজীর স্থাপন করেন। গভর্ণর-জেনারেল বা প্রেসিডেন্টের একটি শাসনতান্ত্রিক প্রধান থাকার কথা এবং ভারতে অবস্থা তাই-ই ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে জিন্নাহ্ গভর্ণর-জেনারেল হওয়ায় এই পদটি প্রধানমন্ত্রী পদের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত প্রস্তাবে গভর্ণর-জেনারেলরূপে জিন্নাহ্ প্রায় স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাই প্রয়োগ করতেন। একটা লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল, পাকিস্তানে রাজনীতি ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক ছিল বলে কোন পদের গুরুত্বে হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর। এভাবেই জিন্নাহ্র মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী থাকায় এই পদ গভর্ণর-জেনারেলের পদ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন এবং গোলাম মোহাম্মদ হন গভর্ণর-জেনারেল। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন একজন বেসামরিক আমলা। জিন্নাহ্ তাঁকে অর্থমন্ত্রীরূপে কেবিনেটে স্থান দেন। সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধিকারী গোলাম মোহাম্মদ জিন্নাহ্র দৃষ্টান্ত অনুসরণে কাজ করে চলেন এবং নাজিমুদ্দিনের দুর্বল ব্যক্তিত্বের সুযোগ নিয়ে সুচতুরভাবে নিজস্ব ক্ষমতা গড়ে তুলতে প্রয়াস পান। যেহেতু তাঁর কোন রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না, তিনি অতি-মাত্রায় সিভিল সার্ভিস এবং পাঞ্জাবী-প্রভাবিত সেনাবাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়েন। পাকিস্তানে রাজনীতি ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে পর্যবসিত হয়েছিল। শাসকচক্রের অধিকাংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী; তারা এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলামের নাম ব্যবহার করত। এই সময়কাল ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা হয়েছে! ফলে বাঙ্গালীদের মধ্যে একটি বঞ্চনা ও নৈরাশ্যের মনোভাব গড়ে উঠতে লাগল। এই মনোভাবই কালক্রমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। কিন্তু এই উপলব্ধি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা সম্পর্কে একটি নতুন চেতনা ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের সময়েই গড়ে উঠতে থাকে। পুরোনো মুসলিম লীগের দ্বিধা-বিভক্তি ও আওয়ামী লীগের জন্ম পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত করে। রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসছিল এবং রাজনীতির গতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এর কিছুকাল পরেই যুব লীগ, গণতন্ত্রী দল প্রভৃতি ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনসমূহ গড়ে ওঠে। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ তার নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দেয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ দল পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাক্কারজনকভাবে পরাজয় বরণ করে। আওয়ামী লীগ ছাড়াও কৃষক শ্রমিক পার্টী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টী নামে আরও দু'টি ধর্মনিরপেক্ষ দলের জন্ম হয়। পাকিস্তানে কম্যুনিষ্ট পার্টী নিষিদ্ধ থাকলেও এর গোপন তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সেনাবাহিনী আমলাতন্ত্র ও বৃহৎ পুঁজির প্রভাবাধীন পাকিস্তানী শাসকচক্র এসব নতুন ঘটনাবলীতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অপসারণ, ১৯৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট গঠন এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী—এসব ছিল দেশে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে প্রতিহত করবার একই চক্রান্তের বিভিন্ন দিক। ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান একটি একনায়কত্বমূলক সংবিধান জনগণের উপর চাপিয়ে দেন এবং তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এটা কার্যতঃ ছিল গণতান্ত্রিক খোলসে একটি স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা। জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা প্রায় ছিল না বললেই চলে; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চরমভাবে খর্ব করা হয় এবং শাসন বিভাগকে করা হয় নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। বাঙ্গালীরা অনুধাবন করতে শুরু করল যে, একমাত্র বয়স্ক ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই তারা দেশের শাসনব্যবস্থায় যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

১৯৬৬ সালের মধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের গতিশীল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ 'পূর্ব পাকিস্তানের' জনগণের জাতীয় প্লাটফর্মে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ-প্রণীত ছয়-দফা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীর নিশ্চয়তা দান করেছিল।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করল যে, জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্মসূচীর পেছনে রয়েছে। মুসলিম লীগ এবং জামাতে ইসলামীর ন্যায় ধর্মীয় দলসমূহ নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়।

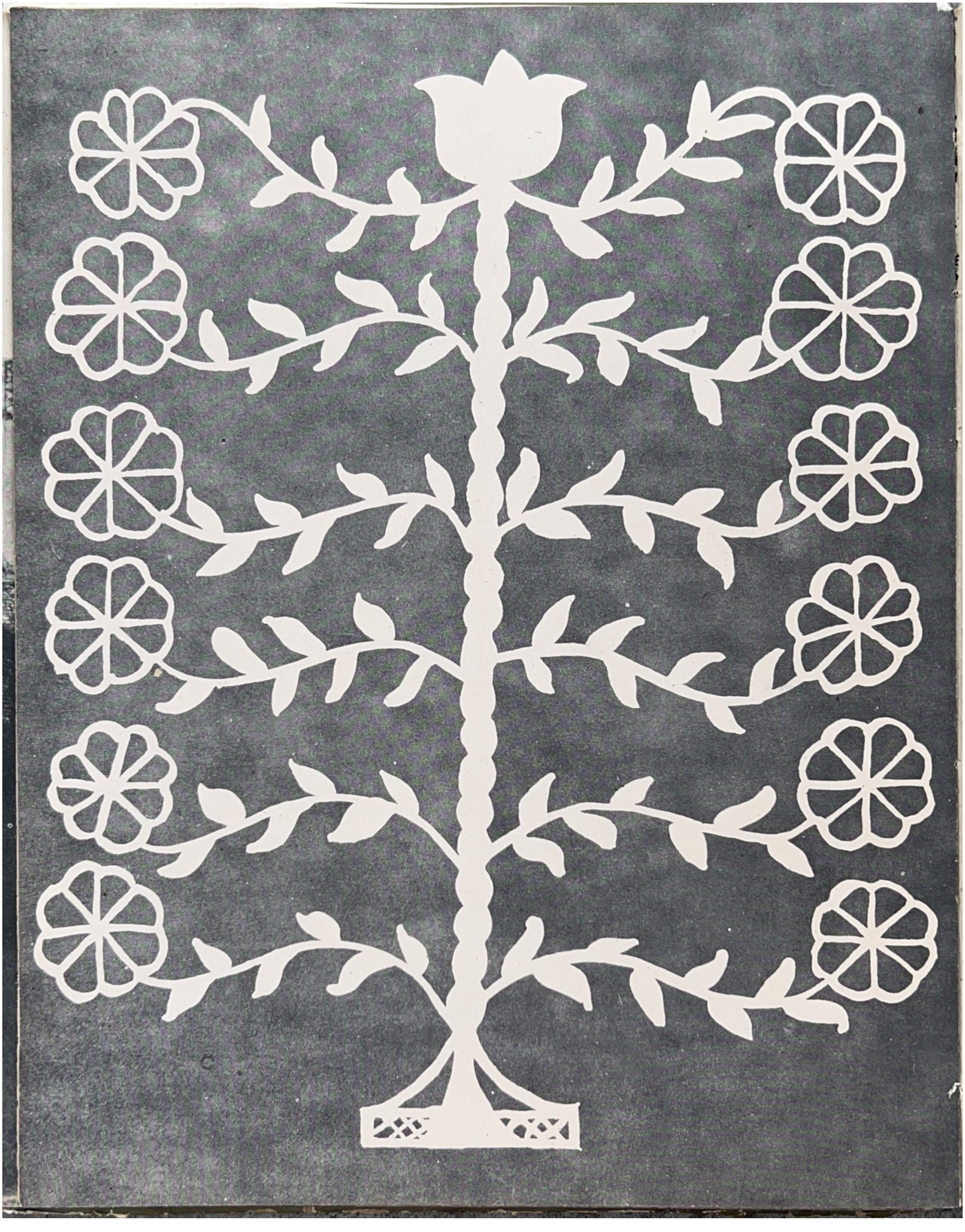

পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র এতদিন জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি কাজে লাগাচ্ছিল। তারা এবার প্রমাদ গুণল। তারা পরিস্থিতির বাস্তবতা মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে পাকিস্তান বাহিনী বাঙ্গালী জনগণের উপর বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সংগঠিত হল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নৃশংস গণহত্যা এবং ইহা বিশ্ববিবেককে গভীরভাবে নাড়া দিল। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ এই অত্যাচার প্রতিহত করতে মরণপণ করে রুখে দাঁড়াল। শুরু হল জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, যার পরিণতিতে সৃষ্টি হল স্বাধীন বাংলাদেশের।

সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের সম্পূর্ণ প্রেক্ষিত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সম্প্রদায়িকতার যে ব্যাধি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিষাক্ত করে আসছিল তার গতি এখন কার্যকরভাবে রুদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, সাম্প্রদায়িকতা বলতে যা আমরা বুঝে থাকি—এখন সেটা অতীতের ব্যাপার। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বাংলাদেশের সমস্ত লোক রাতারাতি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা বন্ধ করে দিয়েছে। কুসংস্কার সহজে মরে না। সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় কুসংস্কারের ক্ষেত্রে এ সত্যটি অধিকতর প্রযোজ্য। হতে পারে, আমাদের মধ্যে কিছু লোক এখনও তাদের পুরাতন চিন্তা ও পুরাতন অভ্যাস বদলাতে পারে নি। কিন্তু বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতাকে বাতিল করে দিয়েছেন এবং তারা ধর্মনিরপেক্ষতায় সুদৃঢ় আস্থাশীল। ইতিহাসের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, আধুনিক যুগে ধর্ম রাষ্ট্রের বা সংস্কৃতির ভিত্তি হতে পারে না। এর দ্বারা ধর্মকে ছোট করা হয়েছে একথা বলা যায় না, বরং বলা যেতে পারে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে অপব্যবহার হতে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ধর্ম ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ই কলুষিত হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম ইতিহাসের এই অকাট্য যুক্তিকেও প্রমাণিত করেছে যে, অবিচার, শোষণ ও জুলুম-ভিত্তিক কোন ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

[মূল ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদঃ মোহাম্মদ আবদুল গফুর]

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হল। একটি ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যটি পাকিস্তান। ভারতবর্ষ আসলে বহুজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। তাই একে কেউ কেউ বলেন উপমহাদেশ। এই উপমহাদেশে শুধু বহু জাতি নয়, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও বহু ধর্মের অস্তিত্ব। অথচ তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হল মধ্যযুগীয় ধর্মীয় জাতিতত্ত্বের একটা প্রচণ্ড ভ্রান্তিকে ভিত্তি করে। এই ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রধান উদ্গাতা মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নাহ্। কিন্তু তার পরিকল্পিত পাকিস্তানের মূল প্রস্তাব, যা লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত, তাতেও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব এবং ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ও পূর্বাঞ্চলে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল, একটি নয়। ভারত ভাগ হওয়ার মুখে—১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের দিল্লী কনভেনশনে জিন্নাহ্ সুকৌশলে লাহোর প্রস্তাবের 'স্টেটস্' কথাটি বদলে 'স্টেট' করে নিলেন। শুরু হল পাকিস্তানে জাতি-শাসন ও শোষণ প্রতিষ্ঠা এবং বহু দূরবর্তী বাংলাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করে রাখার অপচেষ্টা। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের কর্তৃত্ব তখন ছিল উর্দুভাষী ফিউডাল নেতৃত্বের হাতে। তারা সহজেই উপনিবেশের নেটিভ উপশাসকের ভূমিকা গ্রহণে রাজি হলেন এবং আত্মসমর্পণ করলেন পশ্চিম পাকিস্তানী পলিটিক্যাল কাম বুরোক্রাট শাসক চক্রের কাছে।

মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে যে প্রগতিশীল অংশটি ছিল জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে, তাঁর প্রবীণ কর্মকর্তাদের কেউ কেউ মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূতের পদ পেয়ে শাসকচক্রের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন বটে, কিন্তু তরুণ কর্মকর্তারা বিদ্রোহী হলেন। এই বিদ্রোহী তরুণ নেতাদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নাম শেখ মুজিবুর রহমান। মুসলিম লীগের ফিউডাল ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে এরা প্রথমে গঠন করলেন মুসলিম লীগ কর্মী শিবির এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগও আলাদা হয়ে গেল দলের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ

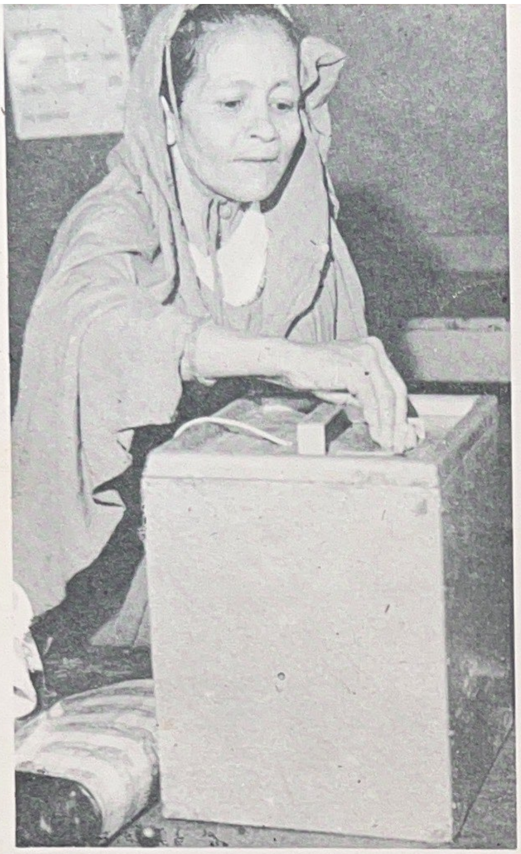

সত্তরের নির্বাচন

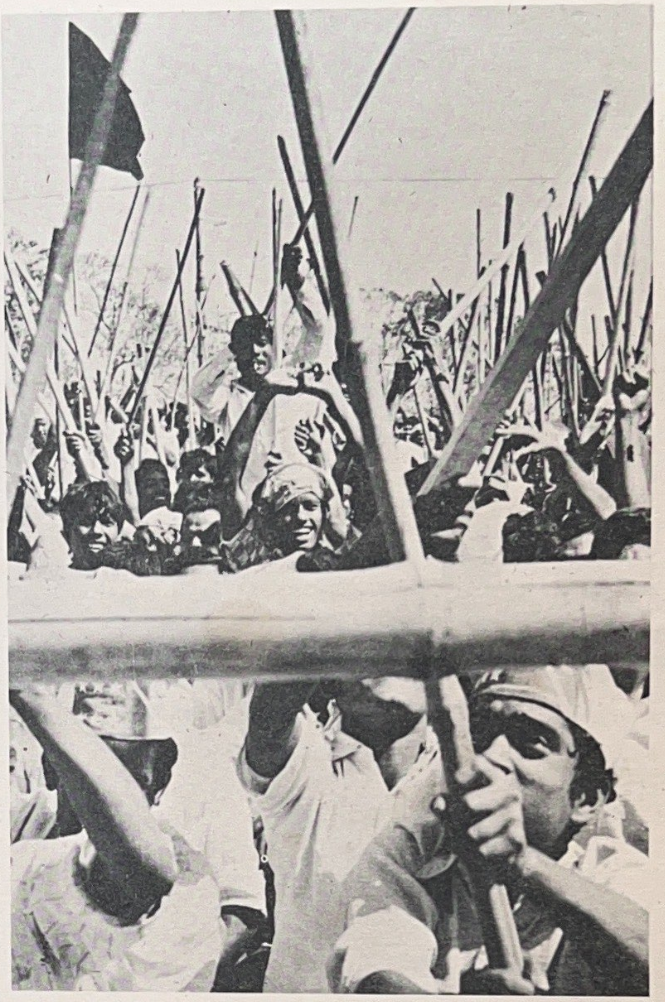

একাত্তরের অসহযোগ

বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ

বাংলাদেশ
প্রাক্তন
পরিষদ

থেকে। এটা ১৯৪৮ সালের ঘটনা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৯৪৮ এই বছরটি রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

এই বছরই তিনটি প্রধান ঘটনা ঘটলো বাংলাদেশে, যা তার ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করলো।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ এলেন ঢাকায় রাজকীয় সফরে। তখন তিনি পাকিস্তানের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বা গভর্ণর জেনারেল। ঢাকার জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 'উর্দু–উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। জিন্নাহ্ সাহেব হয়তো ভেবেছিলেন, কয়েক শতাব্দী আগে বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করতে এসে সংস্কৃত ভাষাভিমানী ব্রাহ্মণ শাসকেরা যেমন ঘোষণা করেছিলেন যে, 'বাংলা রৌরব নরকের ভাষা' এবং অত্যাচার শুরু করেছিলেন বাংলাভাষাভাষী স্থানীয় লোকদের উপর — যার পরিণামে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন নিয়ে তারা পালিয়ে গিয়েছিলেন প্রতিবেশী নেপাল ও অন্যান্য দেশে; বিশ শতকের মধ্যপাদেও তার ঘোষণায় পাকিস্তানের নেটিভ বাঙ্গালী প্রজারা তা-ই করবে। কিন্তু তা হল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে একটি বিদ্রোহী কণ্ঠ জিন্নার ঘোষণার উত্তরে গর্জে উঠলঃ না, না, না। বাংলাদেশে শুরু হল মধ্যযুগীয় অত্যাচার, গ্রেপ্তার, গুলি, নির্যাতন, হত্যা। গঠিত হল প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। প্রতি বছর ১১ই মার্চ তারিখে সারা বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হতে লাগল ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। একই বছরে ঘটল আরেকটি ঘটনা। আইয়ুব খাঁ তখন উপনিবেশ বাংলার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জি, ও, সি। বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণা। তাঁর আত্মজীবনী 'প্রভু নয় বন্ধু' পুস্তকে তিনি বাঙ্গালীদের বর্ণনা করেছেন 'বেঁটে ও কালো' এই দুই বিশেষণ দ্বারা। এই সময় কয়েকটি দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে বাঙ্গালী পুলিশ ধর্মঘট করলো।

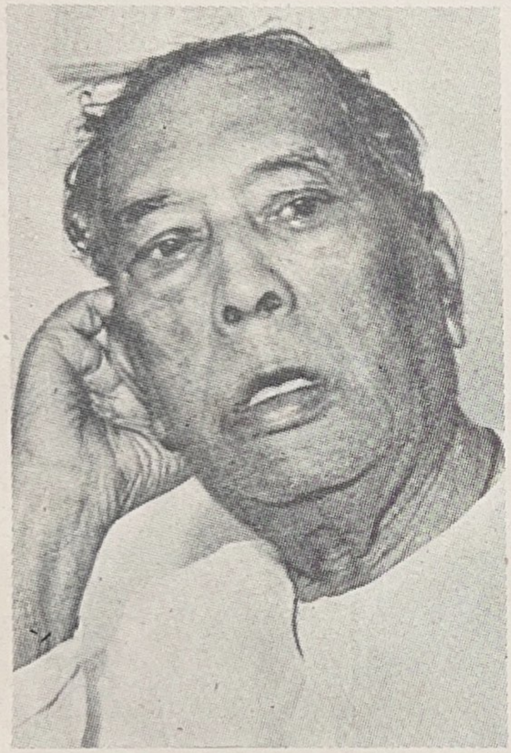

শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক

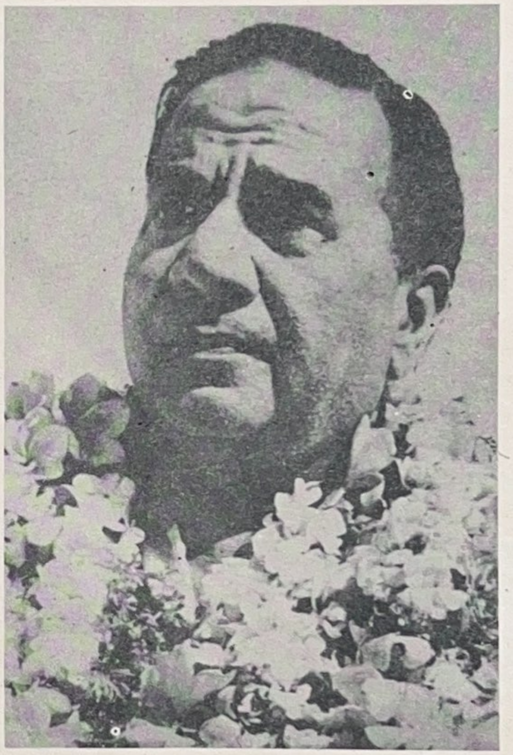

হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী

ঢাকার লালবাগ থানা (যা আবার লালবাগ দুর্গেই অবস্থিত ছিল) হল তাদের হেড কোয়ার্টার।

আইয়ুব ভার নিলেন ধর্মঘটী বাঙ্গালী পুলিশদের শায়েস্তা করার। আলোচনার নামে তিনি সকল ধর্মঘটী পুলিশ-নেতাকে ডেকে পাঠালেন লালবাগ দুর্গে। ততক্ষণে সৈন্যবাহিনী পজিসন নিয়েছে দুর্গের চারপাশে। সরল ও সহজ বাঙ্গালীরা কিছুই বুঝলো না। তারা ফাঁদে পা দিল। অতর্কিতে গুলি বৃষ্টি শুরু হল চারদিক থেকে। রক্তে লাল হয়ে গেল লালবাগ দুর্গের সবুজ মাটি। অসংখ্য পুলিশ শহীদ হল আক্রমণে বাধা দেবার প্রস্তুতির আগেই। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের দিনটি ছিল পয়লা রমজান। মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র মাস ও দিন। এই বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে যে সভা হল ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে, তাতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন বাংলার তখনকার তরুণ রাজনৈতিক নেতারা।

রাজনৈতিক সমঝোতার চেষ্টায় বঙ্গবন্ধু

একজন প্রকাশ্যেই পাকিস্তানের শাসকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন—'তোমরা কেমনতরো ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমান শাসক? তোমরা পবিত্র রমজান মাসকেও মোহরমের মাসে (ইসলামের ইতিহাসে শোকের মাস) পরিণত করতে দ্বিধা কর নি।' ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের বিভ্রম তখন বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করেছে।

তৃতীয় ঘটনাটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর জিন্নার তিরোধান হলো। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হলেন উর্দুভাষী বাঙ্গালী খাজা নাজিমুদ্দীন। প্রধান মন্ত্রী রয়ে গেলেন নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান। শুরু হল শুধু বাংলাভাষার বিরুদ্ধে নয়, তার গোটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্র। বেতার ও সরকারী প্রচার মাধ্যমে শুরু হল বাংলাভাষায় বাংলা শব্দ ছাঁটাই অভিযান। এই সময়

একটি সরকারী বাংলা সাহিত্য মাসিকে প্রকাশিত প্রচ্ছদছবির নীচে লিখে দেয়া হল 'একটি হালখরিদ তাবাহ্‌কুন।' অনেক গবেষণা করে বাঙ্গালী পাঠককে বুঝতে হল, এর অর্থ একটি সদ্য কেনা ডেস্ট্রয়ার। কেবল বাংলা ভাষা থেকে বাংলা শব্দ ছাঁটাই করা নয়, সরকারী তহবিলের লাখ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হল, বাংলা হরফের বদলে উর্দু হরফে বাংলা লেখা জনপ্রিয় করে তোলার অভিযান পরিচালনার জন্য। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাঙ্গালী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। পরবর্তীকালে আইয়ুব আমলে বাংলা বর্ণমালা ও রবীন্দ্র সঙ্গীত-বিরোধী সরকারী অভিযানও ছিল এই বাংলা সংস্কৃতি উচ্ছেদ পরিকল্পনার অংশ।

একদিকে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ এবং অন্যদিকে পুলিশ-বিদ্রোহ ও ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৪৯ সালে ঢাকা শহরে জন্ম নিল আওয়ামী মুসলিম লীগ—বা পরবর্তীকালের আওয়ামী লীগ। প্রথমদিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, শাসকদের কাছে আবেদন-নিবেদন ও প্রতিবাদ জানানোর কর্মসূচী নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলেও পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানকেই সশস্ত্র স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে হবে এটা হয়ত সেদিন কেউ ভাবেন নি। ১৯৫০ সালের শেষ দিকেই সম্ভবতঃ লিয়াকত-মন্ত্রিসভা পাকিস্তানের ভাবী সংবিধানের রূপরেখা হিসেবে বেসিক প্রিন্সিপল্‌স কমিটি বা মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পরিষদে কৌশলে সংখ্যাগুরু বাংলাদেশকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ব্যবস্থা ছিল। শুরু হল বাংলাদেশে এ্যান্টি বি পি সি মুভমেন্ট, যে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার ভার পড়েছিল নবজাত আওয়ামী লীগের তরুণ নেতাদের কাঁধে। ১৯৫১ সাল এই আন্দোলনের আওয়াজে মুখর। এই সালেই ১৬ই অক্টোবর তারিখে পাকিস্তানে আমলাতন্ত্র ও সামরিক চক্রের মিলিত চক্রান্তে রাওয়ালপিন্ডিতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। গভর্ণর জেনারেল নাজিমুদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পূর্বপদে ইস্তাফা না দিয়েই রাতারাতি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। আর গভর্ণর জেনারেল হলেন কুচক্রী আমলা গোলাম মোহাম্মদ। ১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে ঢাকা শহরে সরকারী সফরে এসে নাজিমুদ্দিন জিন্নার কণ্ঠ অনুকরণ করে

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

ঘোষণা করলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' আবার শুরু হল সংগ্রাম। বাংলাদেশব্যাপী হরতাল, ধর্মঘট, ছাত্র-বিক্ষোভ। যার পরিণতি রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারী। এই তারিখে ঢাকার ছাত্রেরা ১৪৪ ধারা অমান্য করে ঢাকার রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের কাছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী নির্বিচারে গুলী চালায়। প্রথম দিনেই গুলীতে শহীদ হন বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার প্রমুখ অসংখ্য ছাত্র ও অন্যান্য পেশার লোক। সারা বাংলাদেশ গর্জে ওঠে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশে পাকিস্তানী প্রশাসন ভেঙে পড়ে।

২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে ছিল—সামরিক শাসন। শহীদের জন্য গায়েবী জাঁনাজা, শোক মিছিলের উপরও সেনাবাহিনী গুলী চালিয়েছে। হাজার হাজার রাজবন্দীতে ভরে গেছে জেলখানা। হাসপাতালে আহতদের স্থান সংকুলান হয় নি। পুরো সাতদিন বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে উড়েছে শোকের কালো পতাকা। শেষ পর্যন্ত সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন, তাঁরা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পুনরায় বিচার বিবেচনা করবেন। প্রাদেশিক পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন নিজে প্রস্তাব তুললেন, বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা করার জন্য। তা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশে প্রথম সফল গণঅভ্যুত্থানের দিন। এই অভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তানী শাসকচক্র সাময়িক পশ্চাদপসরণের কৌশল গ্রহণ করলেন।

মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা যত হ্রাস পাচ্ছিল, তারা ততই আমলাতন্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল। আমলাতন্ত্র ও সামরিক চক্র এক হয়ে এর সুযোগ নিলেন। সেনাপতি আইয়ুব খাঁর সমর্থন পেয়ে আমলা গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করে দিলেন। এবার ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বগুড়ার নবাবজাদা মোহাম্মদ আলী এলেন পুতুল প্রধানমন্ত্রী হয়ে। মোহাম্মদ আলীর আমলেই পাকিস্তানকে সামরিক চুক্তি জোটে ভেড়ানো হল। বাংলাদেশে এর বিরুদ্ধেও হল প্রবল আন্দোলন।

প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় বাংলা-

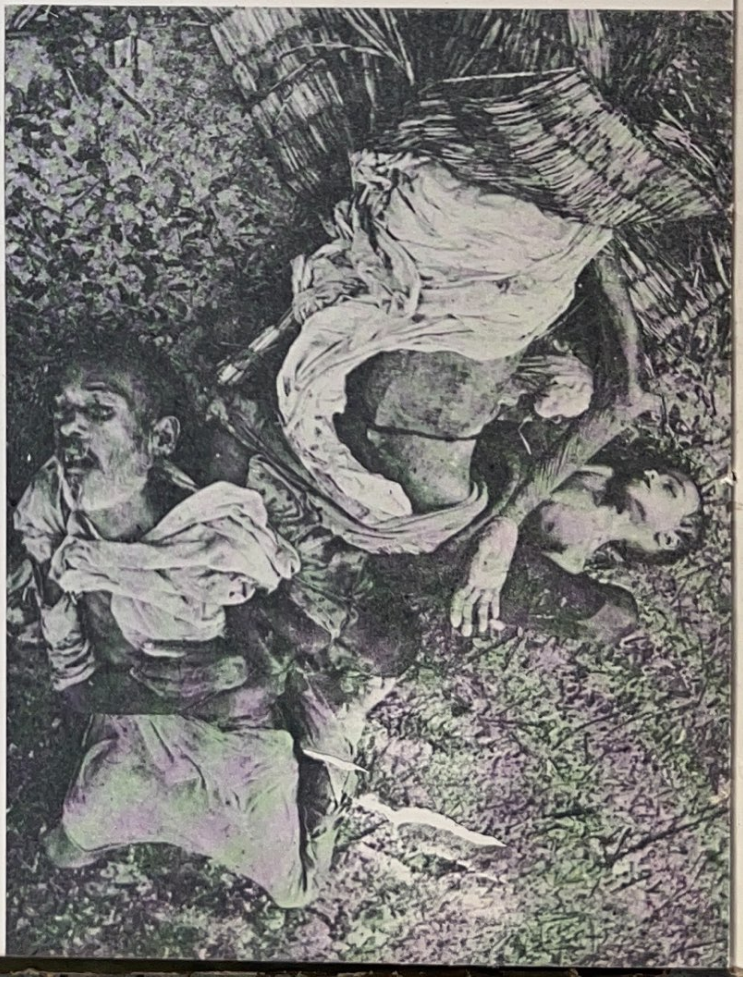

সীমান্তের পথে ভীত-সন্ত্রস্ত বাঙ্গালী

দেশকে অংশীদার করে নেয়ার কোনই ইচ্ছে ছিল না পাঞ্জাবী 'মিলিটারী বুরোক্রাট কমপ্লেক্সের'। তারা মোহাম্মদ আলীকেও একটি সংবিধান প্রণয়নে বাধা দিল এবং তুচ্ছ অজুহাতে গণপরিষদ ভেঙে দেয়ার চক্রান্ত পাকাতে লাগলো। ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে হল সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। শেরে বাংলা ফজলুল হক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট একুশদফার ভিত্তিতে বিপুল বিজয়ের অধিকারী হল। এই একুশ দফার মূল কথা ছিল, বাংলাদেশের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক-স্বায়ত্তশাসন এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান। নির্বাচনী ফল দেখে ঔপনিবেশিক শাসকেরা শঙ্কিত হলেন। গোপন অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চলে—আদমজীনগর ও চন্দ্রঘোনায় বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী শ্রমিক দাঙ্গা বাধিয়ে এবং নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হকের একটি কথিত উক্তির বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা প্রচার করে প্রথমে তারা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করেন। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক হন গৃহবন্দী। শেখ মুজিব সহ হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন। পরে ১৯৫৫ সালে গণপরিষদও ভেঙে দিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তানে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। এই মন্ত্রিসভায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব এলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি প্রধান সেনাপতির দায়িত্বও নিজের হাতে রাখলেন।

অনেক গোপন ও প্রকাশ্য বৈঠক. আলোচনা ও দরকষাকষির পর পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বাংলাদেশ রাষ্ট্রপরিচালনায় তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার ত্যাগ করতে রাজি হল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনায় একবার কেন্দ্রীয় রাজধানী ও সামরিক হেডকোয়ার্টার সংখ্যালঘু অঞ্চলে প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়ে বাঙ্গালীরা চরম স্বার্থত্যাগ করেছে। দ্বিতীয়বার তারা অনুরূপ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার ছেড়ে দিয়ে। ঠিক হল, জাতীয় পরিষদে যেমন উভয় অঞ্চলের সদস্যসংখ্যা

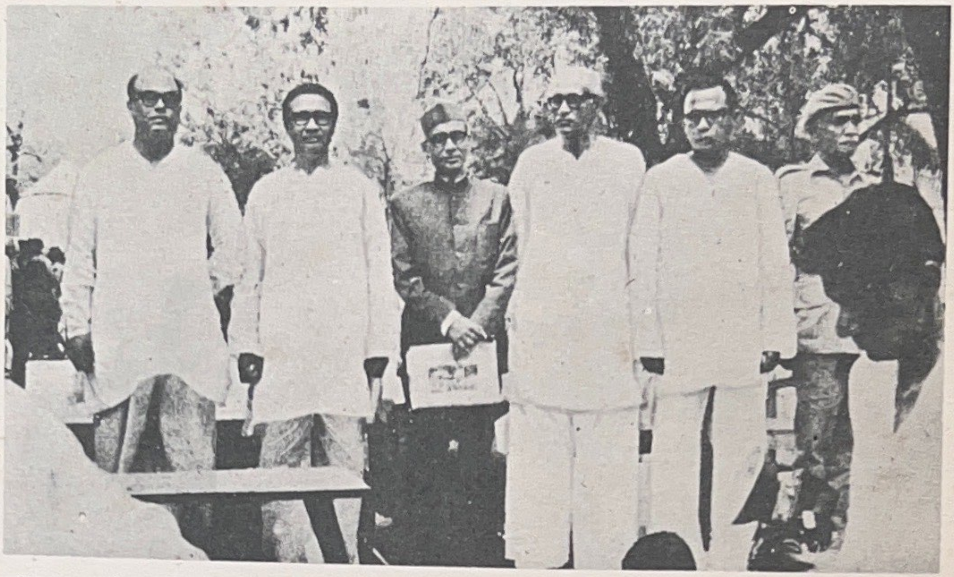

মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা

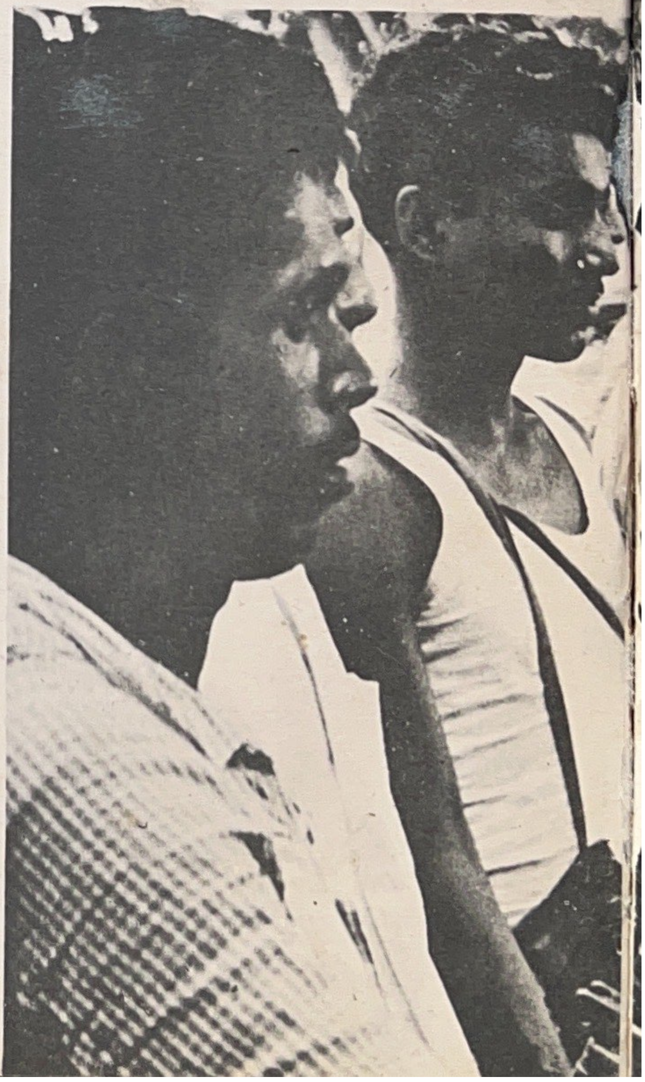

কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-মজুর সবাই মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তি বাহিনীর প্রশিক্ষণ

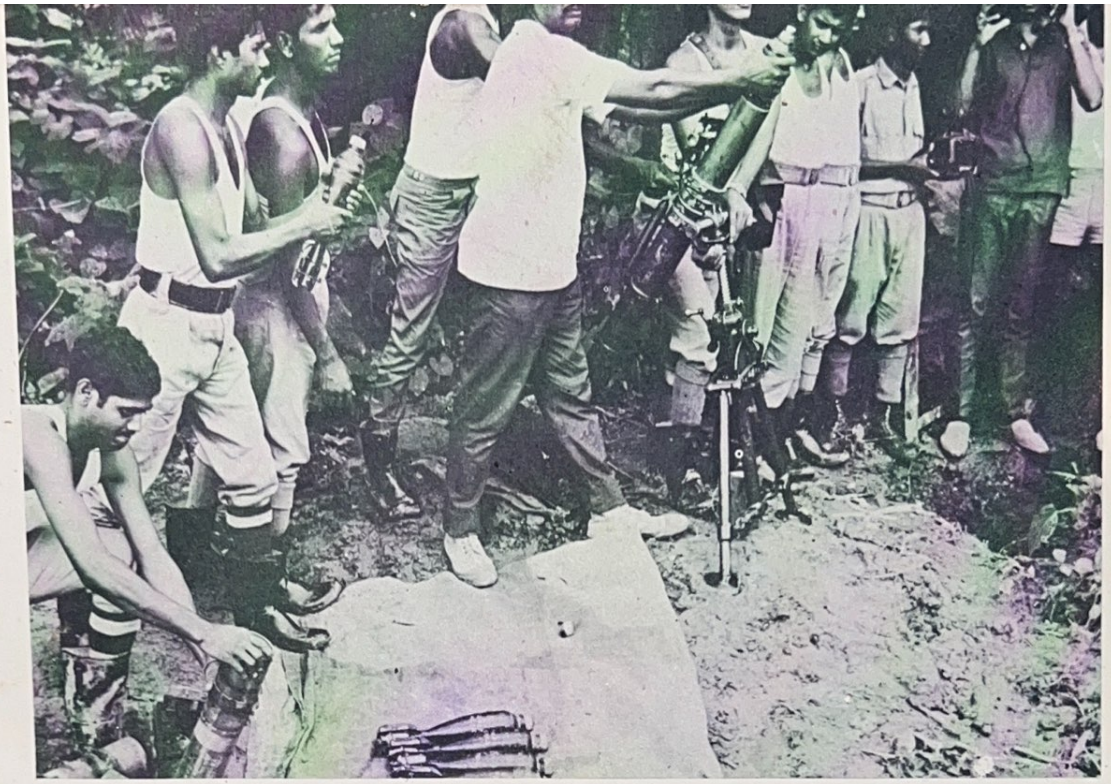

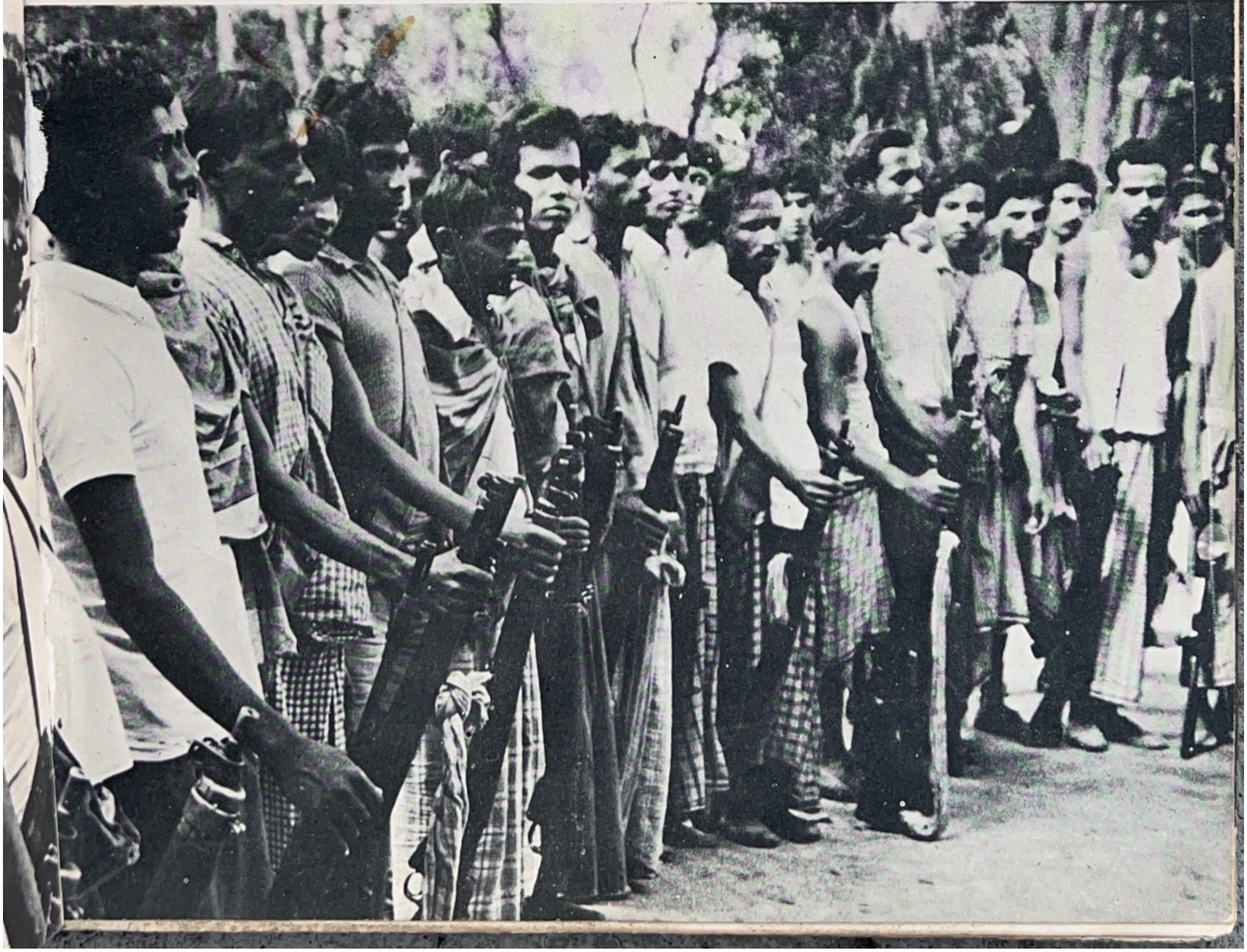

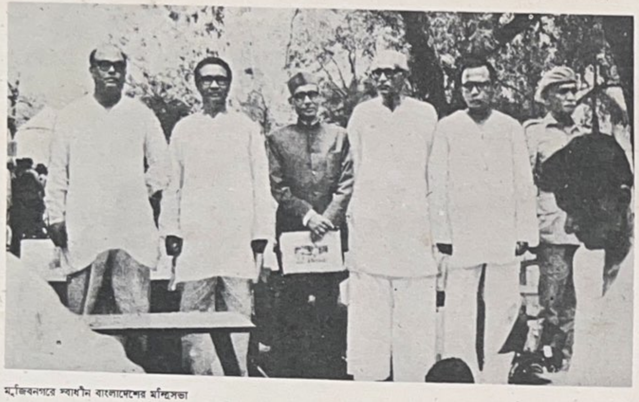

মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা

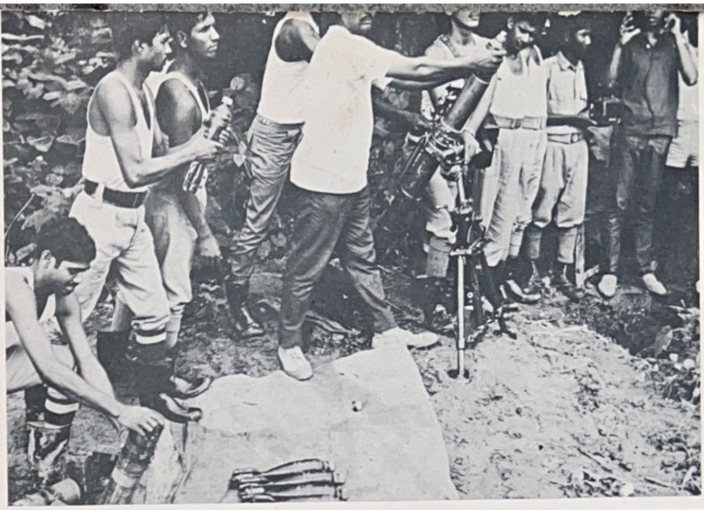

মুক্তি বাহিনীর প্রশিক্ষণ

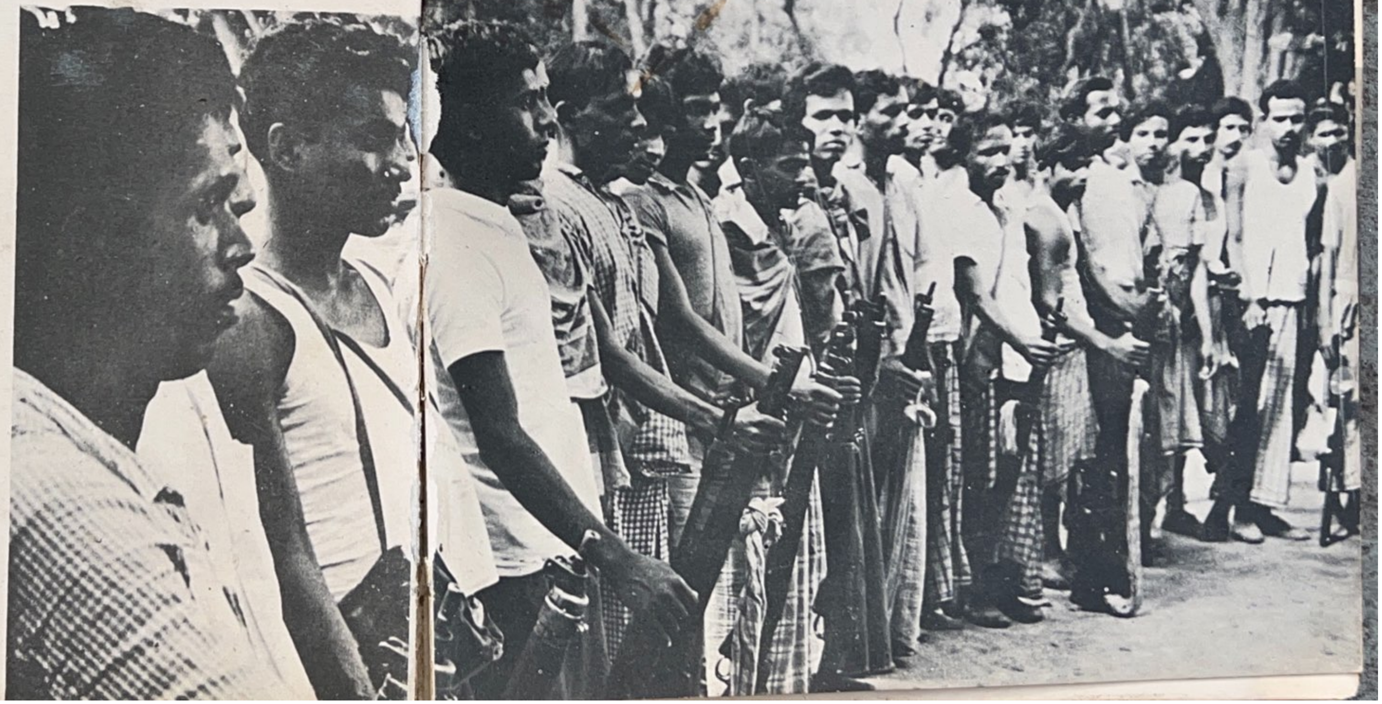

কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-মজুর সবাই মুক্তিযোদ্ধা

সমতার ভিত্তিতে হবে, তেমনি চাকরি-বাকরি থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীদের সমানাধিকার মেনে নেয়া হবে। সংবিধানের ফর্মুলা নিয়ে মীমাংসা হল। দ্বিতীয় গণপরিষদের বৈঠক বসল মারীতে। কিন্তু সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক চক্রের ষড়যন্ত্র রইল অব্যাহত। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী বিদায় নিলেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়ে এলেন ঝানু আমলা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। ততদিনে বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট ভাগ হয়ে গেছে। প্রথম কিছুদিন হক-সাহেবের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের অংশের সঙ্গে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কোয়ালিশন সরকার চালান এবং ১৯৫৬ সালে সংখ্যাসাম্য নীতির ভিত্তিতে প্রথম সংবিধান প্রণীত ও গৃহীত হল। তারপর এলেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর আওয়ামী লীগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়ে। তাঁর কোয়ালিশন সরকারে অঙ্গদল হল সীমান্ত প্রদেশের সাবেক কংগ্রেস নেতা ডাঃ খান সাহেবের রিপাবলিকান পার্টি।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে সংবিধানে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁর কোয়ালিশন সরকারের অঙ্গদল রিপাবলিকান পার্টিও ছিল অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান।

ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কি অলক্ষ্য বিজয় সূচিত হয়েছিল, সেদিন অনেকেই হয়ত তা অনুধাবন করতে পারেন নি। মাত্র তের মাস সরকার পরিচালনার পর সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা যখন সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, তখন তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হল। আর ঠিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্বের মুখে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা বিনা কারণে তুচ্ছ অজুহাত তুলে সংবিধান, মন্ত্রিসভা বাতিল করে সামরিক আইন জারী করলেন। তার সহযোগী হল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ২৭শে অক্টোবর মীর্জা বিতাড়িত হলেন। জেনারেল আইয়ুব হলেন প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক শাসক।

।দুই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের এটা দ্বিতীয় পর্ব।

যুদ্ধরত বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক

এতদিন বাংলাদেশে ছিল পাকিস্তানীদের অপ্রত্যক্ষ শাসন এবং এবার এল প্রত্যক্ষ শাসন। অর্থনৈতিক কলোনী এবার রাজনৈতিক কলোনীতে রূপান্তরিত হল। পাকিস্তানী সামরিক জুন্তা ও আমলাতন্ত্র এবং তাদের দোসর বৃহৎ পুঁজিপতি, মনোপলি ও কার্টেলগুলো পাকিস্তানে সর্বেসর্বা হয়ে উঠল।

তবু বাংলাদেশ ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে লাগল গণতান্ত্রিক আত্মশাসনের স্বীকৃতিলাভের জন্য। তখনও তার আন্দোলন স্বাধিকারের জন্য। ছয় দশকের গোড়ার দিকে একটি অগণতান্ত্রিক সংবিধান বাংলাদেশের মানুষকে মেনে নিতে বাধ্য করার আগে জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হল। ১৯৬২ সালে বাংলাদেশে এই নিয়ে হল তুমুল আন্দোলন। ছাত্রেরা গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবী নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। আইয়ুবের পুলিশ ও সেনাবাহিনী গুলী চালাল। এটা বাংলাদেশে সামরিক জুন্তার বিরুদ্ধে প্রথম গণঅভ্যুত্থানের সূচনা।

বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানে ভীত সামরিক জুন্তা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা করলেন। শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দিলেন দাঙ্গা-প্রতিরোধ আন্দোলনে। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন। স্বাধিকারের অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হল শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতার স্বাক্ষরিত ইশতাহারের ভাষায়ঃ পূর্ব বাংলা রুখে দাঁড়াও। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতা অভিযুক্ত হলেন আইয়ুবের আদালতে।

১৯৬৪ সালে আইয়ুব-প্রবর্তিত বেসিক ডেমোক্রাসির নির্বাচন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আইয়ুব টাকা ছড়িয়ে, ভয় দেখিয়ে প্রশাসন যন্ত্র যথেচ্ছ ব্যবহার করে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর অধিকাংশের ভোটে জিতলেন সকল বিরোধী দলের প্রার্থী মিস্ ফাতেমা জিন্নার বিরুদ্ধে। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বাংলাদেশের স্বাধিকার আদায়ের শেষ আশা নিভে গেল।

১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ এই তিন বছরের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটলো পাকিস্তানে। একে একে ফজলুল হক, সোহ্‌রাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দিন মারা

যুদ্ধাভিযানের প্রাক্কালে মুক্তি ফৌজ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা বাহিনী

গেলেন। পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আশায় সোহ্‌রাওয়াদী তাঁর শেষ জীবনে সকল বিরোধী দলকে মিলিয়ে যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে তাও পড়ল নিষ্ক্রিয় ও ঐক্যহীন হয়ে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সতরদিনব্যাপী যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধে দেখা গেল বাংলাদেশ সম্পূর্ণ অরক্ষিত, অসহায় এবং যুদ্ধের পর দেখা গেল বাংলাদেশের সম্পদ আরো শোষণ করে চলছে পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের চেষ্টায়। বাংলাদেশে জমির দাম নেমে গেল। পাট বেচা টাকা চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে। সোনা চালান হয়ে গেল সেখানে। এতদিন যত বৈদেশিক সাহায্য এসেছে তার সিংহভাগ ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। এবার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মোটা ট্যাক্সের বোঝাও চাপিয়ে দেয়া হল বাংলাদেশের কাঁধে। পঁচিশ বছর বাংলাদেশ তার পাট ও অন্যান্য কাঁচা মাল বেচে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়েও অনেক বেশী। কিন্তু সেই টাকাও অধিকাংশ ব্যয় করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। বৈদেশিক ঋণের চৌদ্দ আনা খরচ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। কিন্তু তার দায়শোধ ও ঋণের মোটা ভাগ চাপানো হয়েছে বাংলাদেশের কাঁধে। পঁচিশ বছরে বাংলাদেশের টাকায় তিনটে রাজধানী শহর তৈরী করা হয়েছে— করাচী, রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদ। অন্যদিকে বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য টাকা সংগ্রহ সম্ভব হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু অববাহিকা পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু বাংলাদেশে বন্যানিয়ন্ত্রণ দূরে থাক, সামান্য পানিসেচের উন্নত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তান তার সংলগ্ন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে আঞ্চলিক উন্নয়ন জোট (আর,সি,ডি) গঠন করে আঞ্চলিক বাণিজ্যের সুবিধা লুটেছে। অথচ বাংলাদেশকে তার সংলগ্ন প্রতিবেশী পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধের অজুহাত তুলে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক সুবিধা গ্রহণ করতে দিতে পাকিস্তান রাজি নয়। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর বিরোধ থাকা সত্ত্বেও খালের পানি সমস্যায় মীমাংসা-চুক্তি করতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আপত্তি নেই। কিন্তু যত আপত্তি বাংলাদেশের বন্যানিয়ন্ত্রণে ভারতের আবশ্যক সহযোগিতা গ্রহণে। জাতিসংঘের পিয়ারসন রিপোর্টেও স্বীকৃত হল বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্যের কথা। বলা হল, পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিতে গভীর নলকূপের সাহায্যে সবুজ বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে তা সম্ভব হয় নি। এককথায় গত পঁচিশ বছর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল শাসক ও শাসিতের।

পশ্চিম পাকিস্তান শিল্পোন্নত, বাংলাদেশ তার একচেটিয়া বাজার। ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, সিভিল ও মিলিটারি সার্ভিসসহ ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুতে তাদের কর্তৃত্ব। প্রতিরক্ষা বাজেটের নিরানব্বই ভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে, এক ভাগ বাংলাদেশে। প্রতিরক্ষা বিভাগের ষোল আনা অফিসার অবাঙ্গালী। জওয়ানদের মধ্যে শতকরা দশভাগেরও কম বাঙ্গালী।

এই রাজনৈতিক পটভূমিতে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছ'দফা প্রস্তাব ঘোষণা করেন। এই প্রস্তাবগুলো হলঃ

(ক) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে ফেডারেশন গঠন এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী সরকার।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুটি বিষয় থাকবে, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি।

(গ) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন। অথবা দু'অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি—তবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মুদ্রা পাচার রোধের জন্য একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স খাজনা-কর আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের। আঞ্চলিক সরকারের আদায় করা রেভিনিউর একটা অংশ ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালী জমা হবে—এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান সংবিধানে রাখা হবে।

(ঙ) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখা হবে এবং এই অর্থ স্ব স্ব আঞ্চলিক সরকারের এখতিয়ারে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দু'অঞ্চল সমানভাবে অথবা সংবিধানের নির্ধারিত হারে দেবে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানী-রফতানীর অধিকার আঞ্চলিক সরকারের থাকবে।

(চ) বাংলাদেশের জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠন করা হবে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ

প্রহরারত মুক্তি বাহিনী

নগরে প্রান্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধ

আত্মনির্ভর হবে।

শেখ মুজিবের এই ছ'দফা বাংলাদেশের মানুষের কাছে অভিনন্দিত হল 'ম্যাগনা কার্টা' বা মুক্তি সনদ রূপে। আর জেনারেল আইয়ুব হুমকি দিলেন, 'এর বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করবেন।' আইয়ুবের ইঙ্গিতে তার পুতুল গভর্ণর মোনেম খাঁ অসংখ্য মামলায় ঝোলাল শেখ মুজিবকে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে কারাদন্ড দেয়া হল। তাঁর সহযোগীদের আটক করা হল। তাঁর উপর নিরাপত্তা আইন ও প্রতিরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হল। ছ'দফার আন্দোলনে বাংলাদেশ গর্জে উঠল ১৯৬৬ সালের ৭ই মার্চ তারিখে। সেনাবাহিনী নেমে এল রাস্তায়। বর্বর দমননীতি প্রয়োগ করে শায়েস্তা করার চেষ্টা করা হল বাংলাদেশকে। আওয়ামী লীগ সমর্থক দৈনিক ইত্তেফাকের প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হল। সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে।

তবু ছ'দফার আন্দোলন ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল বাংলাদেশে। আইয়ুব সরকার বিপদ বুঝলেন। গোপনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উদ্ভাবন করা হল। সেই মামলায় প্রধান আসামী করা হল শেখ মুজিবকে।

ততদিনে সামরিক জুন্তাতেও ভাঙ্গন ধরেছে। ভুট্টো বিদায় হয়েছেন আইয়ুবের মন্ত্রিসভা থেকে। তিনি সামরিক চক্রের একাংশের সহায়তায় আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলেন। এদিকে বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে প্রবল গণ-আন্দোলন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে আন্দোলন রূপান্তরিত হল অভ্যুত্থানে। সশস্ত্র জনতা কারফিউ ভেঙ্গে এগিয়ে গেল মশাল হাতে কুর্মিটোলা সামরিক ছাউনির দিকে। ক্যান্টনমেন্টে তখন চলছিল আগরতলা মামলার তথাকথিত বিচার। গণ-অভ্যুত্থানের আগুনে অচল হয়ে গেল আইয়ুবের প্রশাসন। আইয়ুব মামলা তুলে নিলেন এবং বিনাশর্তে মুক্তি দিলেন সকল অভিযুক্তকে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে সকল দলের রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন। কিন্তু ছ'দফা দাবী মানতে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা রাজি না হওয়ায় শেখ মুজিব বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বাঙালী জাতির কাছে তখন তিনি নন্দিত বঙ্গবন্ধু নামে।

১৯৬৯ সালের পঁচিশে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জেনারেল আইয়ুব সরে দাঁড়ালেন। পাকিস্তানের সামরিক জুন্তায় এলেন নতুন এক কুটচক্রী নেতা। ইয়াহিয়া প্রথমে ভাল মানুষের ভান করলেন। দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন তারিখ ঠিক করে দিলেন। সেই সঙ্গে নির্বাচনের আইনগত কাঠামো বা লিগ্যাল ফ্রেম

ওয়ার্ক ঘোষণা করে ভয় দেখালেন, নির্বাচনের পর ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান তৈরী না হলে কিম্বা তিনি তাতে সই দিতে না পারলে নব-নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হবে। এ ছাড়া সংখ্যা-সাম্যের বিধান তুলে দেয়া হল। শেখ মুজিবের দাবী মেনে নিয়ে সরকারী ঘোষণায় বলা হয়, জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন। তার এক মাস আগে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে এক প্রলয়ংকরী ঝড়ে এক রাতেই মারা গেল দশ লাখ নরনারী। ৩০ লাখ মানুষ হল ছিন্নমূল। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের এত বড় বিপদে রইলেন নির্বিকার হয়ে। সাহায্য আসল বিদেশ থেকে। বাংলাদেশের মানুষ বুঝলো; পাকিস্তানীদের সঙ্গে তাদের এক জাতিত্বের তথাকথিত বন্ধন কত ঠুনকো এবং মিথ্যা। ডিসেম্বরের নির্বাচনে সারা বাংলাদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করল আওয়ামী লীগ। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে জয়লাভ করল জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি। নির্বাচিত হয়েই ভুট্টো হাঁকডাক শুরু করলেন, তিনি সারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি। তিনি ছ'দফা মেনে নেবেন না। তার দল সংখ্যালঘু। তবু তিনি দাবী জানালেন, তাঁকে ক্ষমতার ভাগ দেয়া না হলে তিনি সব বানচাল করে দেবেন।

বানচাল করার চক্রান্তের নীল নক্সা অবশ্য আগেই তৈরি করা হয়েছিল এবং এবার তা কাজে পরিণত করা হল। ১৯৭০ সালের ৭ই জানুয়ারী ছোরা-হাতে এক যুবক বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ধরা পড়ল। সে স্বীকার করল, তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল। চাটগাঁয় গাড়ী-দুর্ঘটনায় হত্যা করার চেষ্টা হল বঙ্গবন্ধুকে। ২৭শে জানুয়ারী ভুট্টো এলেন ঢাকায়। বসলো বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠক। করাচী ফেরার সময় বললেন, আবার আসবো। কিন্তু গিয়ে বললেন, ছ'দফা দাবী মানি না। জাতীয় পরিষদে বসবো না আমার দাবী মানা না হলে। এদিকে ৩০শে জানুয়ারী আরেক কান্ড। ভারতীয় বিমান "গঙ্গা" হাইজ্যাক করে লাহোরে নামাল দুই পাকিস্তানী স্পাই। বলা হল কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা। ভারত-বিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টি করে জাতীয় পরিষদের বৈঠক যাতে না হয় তার অপচেষ্টা হল। ভুট্টো গিয়ে দেখা করলেন পাকিস্তানী স্পাইদের সঙ্গে। তারা গঙ্গা বিমান উড়িয়ে দিল। শেখ

মুক্ত এলাকা

রণাঙ্গনে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ

মুজিব এই বিমান হাইজ্যাকের পেছনে যে চক্রান্ত কাজ করছে তার নিন্দা করলেন। ভারত সরকার তার দেশের উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান ওড়া নিষিদ্ধ করে দিলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসবে। এরপরই শুরু হল ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর একাধিক গোপন বৈঠক ও ভোজ। ঢাকায় কয়েকটি আধা-সরকারী অফিসে গোপনে বোমা ফাটিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা হল, জাতীয় পরিষদের বৈঠক হওয়ার মত পরিবেশ ঢাকায় নেই। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া-ভুট্টো গোপন বৈঠক এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভুট্টো ঘোষণা করলেনঃ 'জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখতে হবে। তার দলের সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়া পরিষদের বৈঠক বসলে তিনি করাচী থেকে খাইবার পর্যন্ত আগুন জ্বালাবেন।' অথচ তার আগের দিনই পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের ৩৩ জন সদস্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১লা মার্চ ইয়াহিয়া নাটকীয়ভাবে বেতার ঘোষণায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন।

প্রতিবাদে বাংলাদেশ গর্জে উঠল। এবার স্বাধিকার নয়, সমঝোতা নয়, স্বাধীনতার সংগ্রাম। ঢাকার রাজপথে উন্মত্ত জনতার ঢল নামলো। স্টেডিয়ামে খেলা ভেঙ্গে গেল। স্টেট বাসে আগুন ধরল। বঙ্গবন্ধু সেদিনই দিলেন সংগ্রামের কর্মসূচী। ২রা ও ৩রা মার্চ হরতাল। ৭ই মার্চ রমনার ময়দানে জনসভা। ২রা মার্চ রাত পৌনে আটটায় ঢাকা বেতারের ঘোষণায় শহরে কারফিউ বলবৎ করবার ঘোষণা প্রচার করা হল। সংবাদপত্রে সেন্সরশিপ দেয়া হল। উন্মত্ত জনতা কারফিউ ভাঙলো। বহুলোক নিহত হল। সংবাদপত্রের সাংবাদিকেরা সেন্সরশিপের আদেশ অমান্য করলেন। ৩রা মার্চ ভুট্টো বসলেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকে। ওই দিনই ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, ১০ই মার্চ তিনি এক নেতৃসম্মেলন আহ্বান করেছেন। শেখ মুজিব এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করলেন, "ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে বাঙালীরা যখন সেনাবাহিনীর গুলিতে শহীদ হচ্ছে, তখন এই আমন্ত্রণ এক নির্মম তামাসা। বন্দুকের নল উচিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমাকে।" ঢাকার পল্টন ময়দানের সভায় বঙ্গবন্ধু দিলেন পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচী। বললেন—'এটা অস্ত্রধারী পশুশক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনতার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।' তিনি সরকারী অফিস আদালত বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। খাজনা ও ট্যাক্স প্রদান স্থগিত রাখতে বললেন।

চারদিকে সেনাবাহিনীর নির্মম হত্যাভিযানের মুখে ৬ই মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকার কথা ঘোষণা করেন। ওই দিনই লেফটেনান্ট জেনারেল টিক্কা খাঁকে বাংলাদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়। ৭ই মার্চ রমনার ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেনঃ এটা মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি শর্ত দিলেনঃ সামরিক আইন তুলে নিতে হবে, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে, গণহত্যার উপযুক্ত তদন্ত হবে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে—এবং একমাত্র এই শর্ত পূরণ হলে তিনি

মিত্র বাহিনীর ঢাকা প্রবেশ

স্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, বীমা কোম্পানীসমূহ, বৈদেশিক দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইত্যাদির ন্যায় সকল সরকারী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান কেন্দ্রগুলো অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের অগ্রগতিতে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানী স্কুলবয়সী ছাত্রসংখ্যা বাড়লেও অবহেলাজনক এক সচেতন নীতির মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পায়। অথচ উপরোক্ত একই সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৫০ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানী শিশুদের একটি উন্নততর শিক্ষার সুযোগ দানের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ সেক্ষেত্রে ২০ বছরে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে পাঁচ গুণ, আর পশ্চিম পাকিস্তানে তা বেড়েছে ৩০ গুণ। গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যাপারে কৃষি চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের ১৬টির মধ্যে ১৩টি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। কলম্বো প্ল্যান, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, কমনওয়েলথ সাহায্য ইত্যাদির অধীনে বিদেশে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য যেসব বৃত্তি দেয়া হয় তার অধিকাংশ গিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে।

বেসামরিক, সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকুরী ও নিয়োগের ব্যাপারে এই বৈষম্য যে আরও ব্যাপক ছিল নিম্নের তথ্যতালিকা থেকে তা বোঝা যায়ঃ

		পঃ পাকিস্তান	পূঃ পাকিস্তান
১। কেন্দ্রীয় বেসামরিক চাকরী	...	৮৪%	১৬%
২। বৈদেশিক চাকরী	...	৮৫%	১৫%
৩। স্থলবাহিনী	...	৯৫%	৫%

ঢাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন

৪। নৌবাহিনী (কারিগরী)	৮১%	১৯%
৫। নৌবাহিনী (অকারিগরী	৯১%	৯%
৬। বিমান বাহিনীর বৈমানিক	৮৯%	১১%
৭। সশস্ত্র বাহিনী (সংখ্যায়)	৫০.০০০	২০,০০০
৮। পাকিস্তান এয়ারলাইন্স (সংখ্যায়) ...	৭,০০০	২৮০

সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা উন্নততর ছিল না।

১। জনসংখ্যা	৫ কোটি ৫০	৭ কোটি ৫০ লক্ষ
২। ডাক্তারের সংখ্যা ...	১২.৪০০	৭.৬০০
৩। হাসপাতালের বেড সংখ্যা ...	২৬,০০০	৬;০০০
৪। পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ...	৩২৫	৮৮
৫। শহর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র	৮১	৫২

অর্থনীতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের সমীকরণের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে প্রাচীন ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ করার তথ্যটিই নির্ভুলভাবে প্রকাশ পায়। অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হত তাতে শুধু যে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানকে শিল্পোন্নত করা হয়েছে তা নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প পণ্যের জন্য একটি অধীন ও স্থায়ী বাজার হিসাবেই পূর্ব পাকিস্তানকে রাখা হয়েছিল।

দুই অঞ্চলের মাথাপিছু আয়ের পার্থক্যের মধ্যেও এই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে বেশী ছিল শতকরা ৩২ ভাগ। দশ বছর পর ১৯৬৯·৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে শতকরা ৬১ ভাগ বেশি।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য চাল আর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গম। পশ্চিম পাকিস্তানে চালের বাজার দর মণ প্রতি ১৮ টাকা, পূর্ব পাকিস্তানে তা ৫০ টাকা। গমের মণ পশ্চিম পাকিস্তানে ১০ টাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৩৫ টাকা।

১৯৭০ সালের শেষের দিকে পূর্ব বাংলা সহ গোটা পাকিস্তানে এক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে

পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে (অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ৭টি মহিলা আসন সহ)। পশ্চিম পাকিস্তানেও শেখ সাহেবের কিছু সংখ্যক সমর্থক ছিল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ছিল তাঁর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো পরিচালিত এবং সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক দ্বিতীয় বৃহত্তম দল পাকিস্তান পিপলস্ পার্টী পায় ৮৮টি আসন। ৩১৩ জন সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে অন্যান্য সকল দল মিলিতভাবে পায় ৫৮টি আসন। ৬ দফা তথা পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে রচিত কর্মসূচীর প্রতি আওয়ামী লীগ লাভ করে গণ রায়।

পাকিস্তানের তদানীন্তন শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক জান্তার সাথে বিভিন্ন দলের যে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক আলোচনা চলে তার ইতিহাস কালিমা লিপ্ত। প্রত্যেকের নিকট একটি জিনিষ পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, সামরিক বাহিনীর লোক হোক বা বেসামরিক রাজনৈতিক ব্যক্তি হোক সকল পশ্চিম পাকিস্তানীই শেখ মুজিবের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে এবং তাঁকে এমন পর্যন্ত বলে যে, তিনি যদি তাঁদের শর্তাবলী না মানেন তবে তাঁরা তাঁর অভূতপূর্ব বিজয়ও ব্যর্থ করে দেবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ভীতি প্রদর্শন বা অস্ত্র বলের নিকট মাথা নোয়াতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। শেখ মুজিব জনগণের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে তোলেন তা অতুলনীয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যখন বুঝলো যে, এই ঐক্যে তারা ভাংগন ধরাতে পারবে না এবং পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের নেতা শেখ মুজিবের পিছনে দৃঢ়ভাবে থাকতে কৃতসংকল্প তখন বেপরোয়া হয়ে এবং সম্ভবত বেপরোয়াভাবজনিত মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় তারা সামরিক বাহিনীর আওতাভুক্ত সমস্ত ধ্বংসশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র বেসামরিক লোকজনকে তারা মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত শত্রু সেনারূপে গণ্য করে। বন্দুক, কামান, ট্যাঙ্ক ও নদীপথে উভচর সামরিক নৌ-যান ইত্যাদি তারা ব্যবহার করেছে। ব্যাপক ভীতির রাজত্ব কায়েম করে মানুষের মনোবল বা সংকল্প বিনষ্ট করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। এখানেই তারা করেছে চরম ভুল এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অর্থাৎ যেদিন থেকে তারা সামরিক অভিযান শুরু করে সেদিনই বাংলাদেশের জন্ম হয়। মানুষ যে কতখানি পশু হতে পারে সে ব্যাপারে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দিন পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বৈদেশিক পর্যবেক্ষক, রিপোর্টার ও সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে অতি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন, তাই আমি ব্যাপক হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসলীলার বিবরণ আর দিতে চাই না।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই সামরিক অভিযানের তৎপরতা ভারতকে অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে আঘাত করেছে। বাংলাদেশের এক কোটী মানুষ তাদের নিজ গ্রাম ও শহর ছেড়ে পার্শ্ববর্তী ভারতীয় এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের সন্ধানে চলে আসে। মাথা গোজার জন্য রাতারাতি আশ্রয়স্থল তৈরী, খাদ্যের ব্যবস্থা, শিবির পরিচালনা ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থাদি করতে হয়। এ ব্যাপারে সারা বিশ্বে উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা দেখা দেয়, কিন্তু বিদেশ থেকে সাহার্য্য আসে অতি সামান্য। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, শরণার্থী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে ভারতকেই শতকরা ৯০ ভাগ ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে।

বিশ্বের কাছে আবেদন জানিয়ে আমরা বলেছিলাম, যে-অবিরাম মানবিক স্রোত আমাদের দেশের দিকে প্রবাহিত হয়ে আসছে তার থেকে আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। তারা সার্বভৌম রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অসমর্থতার যুক্তি প্রদর্শন করেন। ইন্দিরা মন্ত্রিসভার প্রায় এক ডজন মন্ত্রী মোট ৮৫টির মত দেশ সফর করে তাদেরকে পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব এবং আমাদের ঘাড়ে যে বোঝা চেপেছে তার দুর্বিষহতা অবহিত করেন। বহু সমবেদনার রব তুললেও বিশ্ব এ-ব্যাপারে বিশেষ কিছু করে নি।

প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ছয়টি পশ্চিমী দেশ সফর করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের নেতৃবৃন্দকে ব্যক্তিগতভাবে সব বিষয় ব্যক্ত করেন। এসব দেশের প্রত্যেকটিরই মানবিক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রয়েছে, সকলেই পশ্চিমী জগতের নেতা এবং সবাই অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে অতি উন্নত। লন্ডন, প্যারিস ও বন-এ প্রধানমন্ত্রী সামান্য কিছু অনুকূল সাড়া পেলেও ওয়াশিংটন থেকে চা'এর সৌজন্য ছাড়া আর কোন সহানুভূতি পান নি। তিনি দৃঢ় সংকল্প ও হতাশা নিয়ে ফিরে আসেন। শরণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও আমাদের নীতিসমূহের প্রতি অবিচল থাকার ব্যাপারে ছিল তাঁর দৃঢ় সংকল্প এবং অন্যদিকে এই উপমহাদেশের অবস্থা অনুধাবনের ব্যাপারে বহির্বিশ্বের ক্ষীণতম বাস্তবতাবোধহীনতাই তাঁর হতাশার কারণ।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের যুবসমাজ একটি শক্তিশালী সংগ্রামী বাহিনীতে পরিণত হয়। হত্যাকান্ড ও অশান্তির গর্ভ থেকে উদ্ভূত এবং গোপনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিবাহিনী আকস্মিকভাবে একটি দানবধ্বংসী শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে। পাকিস্তানী শাসকরা শেখ মুজিবকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গিয়ে অশেষ কারাক্লেশ ভোগে বাধ্য করে। তাঁর অনুপস্থিতিতে অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন

আহমদের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কাজ করতে থাকে। এই সরকার সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগ সদস্যদের সমবায়ে গঠিত হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র সার্থকভাবে প্রতিফলিত করার অন্তর্দৃষ্টি ও স্বচ্ছতা তাঁদের ছিল। এ মুক্তি যুদ্ধ যে কেবল আওয়ামী লীগ পরিচালিত নয় বরং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ব্যাপক জনসমষ্টি, শ্রমিক, কৃষক, যুবক ও বুদ্ধিজীবীসহ সকল ব্যক্তি ও জনতার সকল অংশ এই সংগ্রামের কাতারে ছিল, এ বিষয়টি তাঁরা অনুধাবন করেন।

প্রতিটি চাপ ও উদ্বেগের আঘাত গিয়ে পড়ছিল আমাদের প্রধান মন্ত্রীর উপর। পৃথিবীর বৃহত্তর অংশই নীরব ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালনের পথ বেছে নেয়। ভারতের ঘাড়ে আপতিত অর্থনৈতিক বোঝা অসহনীয় হয়ে উঠে। আমাদের নিরাপত্তার ঝুঁকিও উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যগণ কর্তৃক পরিচালিত হত্যা ও ধর্ষণের খবরে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী ভারতীয় গ্রামগুলোতে বিক্ষোভের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। ক্ষমতামত্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতীয় সীমান্ত ও সীমান্তের অভ্যন্তরে উস্কানি দিয়ে চলছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য ভারতীয় পার্লামেন্টে সোচ্চারিত হয়ে উঠে জোরালো এক দাবী। পরিস্থিতিজনিত এসব প্রতিটি ব্যাপারই প্রধান মন্ত্রীর জন্য নিত্য নব সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে। সুদৃঢ় সংকল্প ও আত্মমর্যাদা নিয়ে তিনি, এককভাবে হিমাদ্রির ন্যায় অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। জনসাধারণ দেশ ও রাজনৈতিক দলকে নেতৃত্ব দেন এবং আমাদের জাতি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মচারী, সামরিক বাহিনীর জেনারেল ও সমাজ কর্মীগণকে তিনি নির্দেশনা দিতে থাকেন। তাঁর বাণী ছিল অতি সরলঃ আমরা শান্তিতেই বাস করতে চাই, কিন্তু আমাদের দুঃখ, যন্ত্রণা ও বিপদের মুহূর্তে গোটা পৃথিবী বধির, অন্ধ ও বোবা হয়ে রয়েছে বলে আমরা আমাদের নিরাপত্তা ও অর্থনীতি বিঘ্নিত হতে দিতে পারি না। হতাশ না হয়ে আমরা এখনও আশা করছি যে বিশ্ব জনমত জেগে উঠবেই এবং অন্ধকারের পঙ্কে নিপতিত পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকে আজিকার দিনের বাস্তবতা উপলব্ধির ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবে এবং যে কোনভাবে শান্তি রক্ষা করা যাবে।

পরিণতিতে পাকিস্তানের সৈনিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানই ভীত-সন্ত্রস্ত ও স্নায়ুবিক দৌর্বল্যগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর শক্তিশালী বিদেশী বন্ধুদের সহায়তায় নিজের মনে মনে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাঁর সৈন্যরা তৈমুরলঙ এবং নাদির শাহের বংশধর এবং ভারতকে নতি স্বীকার করাবার জন্য তাঁর সৈন্যরা ঢাকা থেকে শুধু শ্রীনগরের দিকে মার্চ শুরু করার অপেক্ষা করছে। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে তিনি ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক লক্ষ্যস্থলগুলোকে বোমার আঘাতে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, সেদিন শেষ রাতে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৬ই ডিসেম্বর যেদিন ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে সেদিন পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলে। ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের নিকট জেনারেল নিয়াজী আনুষ্ঠানিকভাবে এক আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দান করেন। ঢাকা পতনের ৫ ঘন্টা পর ভারতের প্রধান মন্ত্রী একতরফাভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনে এক যুদ্ধবিরতি আদেশ দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকরী করার নির্দেশ দেন।

এভাবে বাংলাদেশের জন্ম হয়, এ জন্ম দুঃখ বেদনা-বিধুর হলেও গৌরবমণ্ডিত। বাংলাদেশের মানুষের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী তাঁর জনগণের কাছে ফিরে আসেন। সর্বাপেক্ষা অবিশ্বাস্য ব্যাপার এই যে, এই জনবহুল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আজ বেসামরিক প্রশাসন যন্ত্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েই চলেছে। গণহত্যার চিহ্ন আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। পৃথিবীর ৮০টিরও* বেশী দেশ দিয়েছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, এর মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের ৪টি স্থায়ী সদস্যও রয়েছে। ভাবী বছর, দশক ও শতাব্দীগুলোতে প্রতিটি বিষয়ে ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী ও সহযোগিতা উন্নত ও সুদৃঢ় হবে বলে আমরা আশা ও কামনা করি। দুই রাষ্ট্রই যে শান্তি চায় সমগ্র বিশ্বের নিকট তা ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আজ সমাপ্ত। আমরা এখন দারিদ্র ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত।†

মূল ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদঃ শ্রী বিনোদ দাশগুপ্ত

---

*নিবন্ধটি ছাপাখানায় যাওয়ার সময় পর্যন্ত ৯৭টি দেশ স্বীকৃতি দেয়।

†'সোসালিষ্ট ইন্ডিয়া' ১৯৭২ সালের ১২ই আগষ্টে, সংখ্যায় প্রকাশিত 'ইমার্জেন্স অব বাংলাদেশ' নামক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত ও অনূদিত।

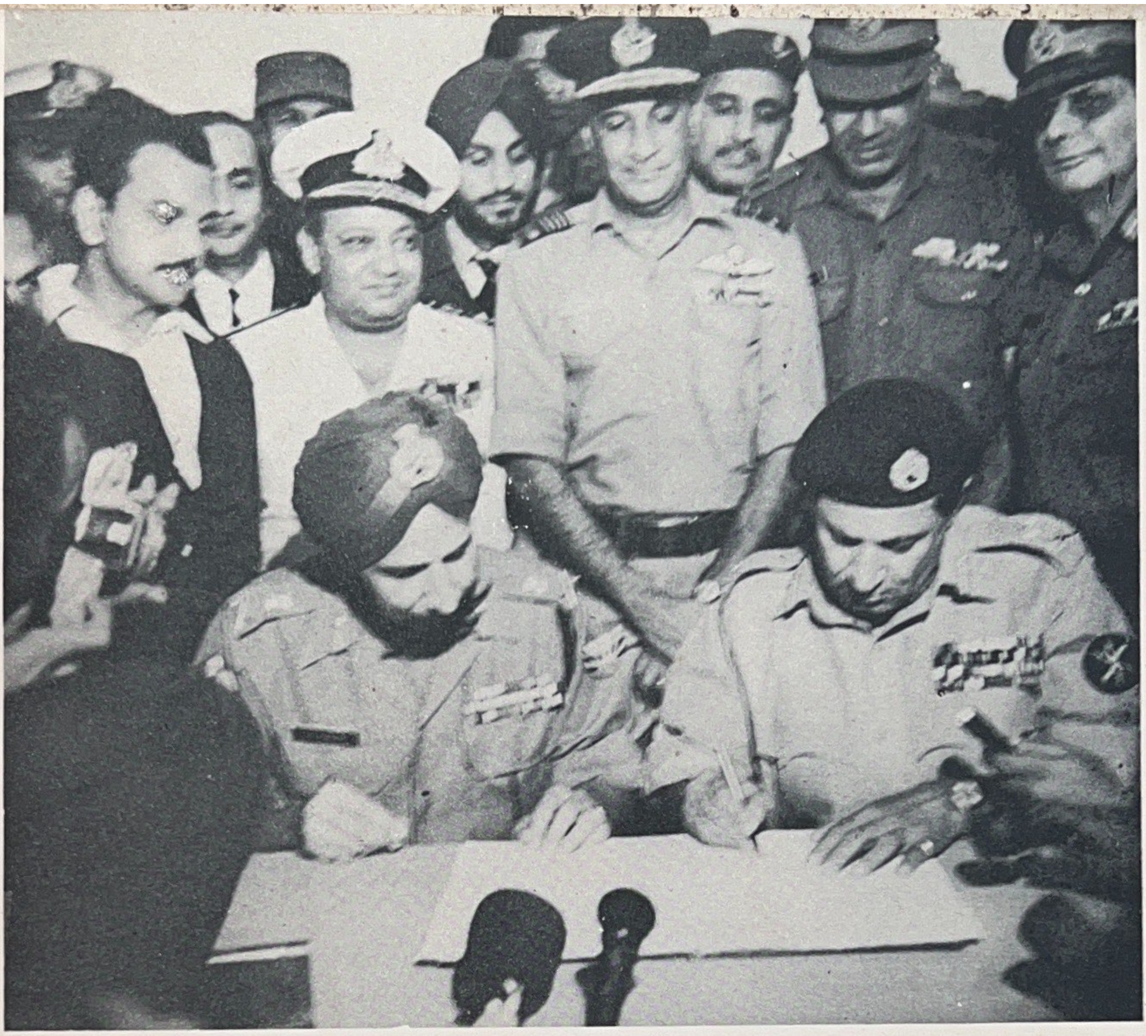

মিত্র বাহিনীর কাছে দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল

মিত্র বাহিনীর বিদায়ী কুচ্‌কাওয়াজ

জাগ্রত জনতা

জাতীয়তাবাদের ভূমিকা

সরদার ফজলুল করিম

এ অসংগতিভরা পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের মানুষ একটা রাষ্ট্রীয় সীমানা বদলে দিল কিংবা একটা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ভেংগে দিল কিংবা একটি রাষ্ট্রীয় সীমানা বুকের রক্ত ঢেলে চিহ্নিত করল—এটাই বড় কথা নয়। এখনো পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্র অসংগতভাবে বিভক্ত। বহু রাষ্ট্রের মানুষ অসংগতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত।

কিন্তু যাঁরা মানুষের চেতনার ক্রমবিকাশকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করেন তাঁদের কাছে বাংলাদেশের জনসমষ্টির চেতনার বিকাশ এবং নূতনতর স্তরে তার উত্তরণের যে সাক্ষ্য ১৯৭১ সালের ঘটনা বহন করছে তার তাৎপর্য সত্যই গভীর, আনন্দজনক এবং বিস্ময়কর।

দূরের মানুষের কাছে এ ঘটনার তাৎপর্য কতোখানি অনুভূত তা বাংলাদেশের অধিবাসীদের পক্ষে বলা দুষ্কর। কিন্তু এই ঘটনার যারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী তাদের কাছে এ অভিজ্ঞতার শিক্ষা অবশ্যই গভীরভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা সত্য, একটি জনতা বা জাতির ক্ষেত্রেও তা সত্য। তার চেতনার বিকাশে অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। চেতনার বিকাশের জন্য প্রয়োজন ঘটনার, সংঘাতের, শত্রুমিত্রের সাক্ষাতের, অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশের সংগে মোকাবেলার।

সমগ্র বাংলার মানুষ বাংগালী। পশ্চিম বংগের এবং পূর্ব বংগের। তবু পূর্ব এবং পশ্চিম বংগের আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে। ঐতিহাসিক এবং সমাজতত্ত্ববিদগণ তা লিপিবদ্ধ করেছেন। সে বৈশিষ্ট্য কেবল এই নয় যে, পূর্ব বংগের অধিকাংশ মানুষ ধর্মগতভাবে মুসলমান আর পশ্চিম বংগের অধিকাংশ মানুষ ধর্মগতভাবে হিন্দু। তার চেয়েও বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্ব বংগের অধিকাংশ মানুষই কৃষক। বলা যেতে পারে পশ্চিম বংগের অধিকাংশ মানুষও কৃষক। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে ঊনবিংশ-বিংশ শতকে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে যে নূতন অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয় তার প্রভাব প্রধানতঃ পড়ে পশ্চিম বংগের জনসাধারণের উপর। সেখান থেকেই প্রধানতঃ জন্মগ্রহণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংগালী মধ্যবিত্ত। কিন্তু এই পরিবর্তনের প্রবাহ পূর্ব বংগের কৃষক জনসমাজে লাগে কম। এর অর্থনীতিক রূপান্তর হয় বিলম্বিত।

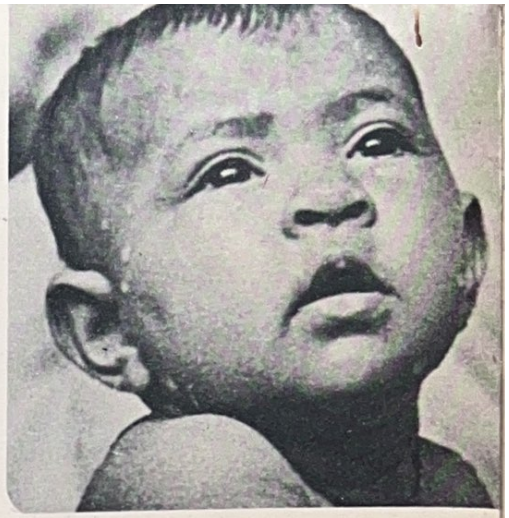

ভবিষ্যতের নাগরিক

চাষী

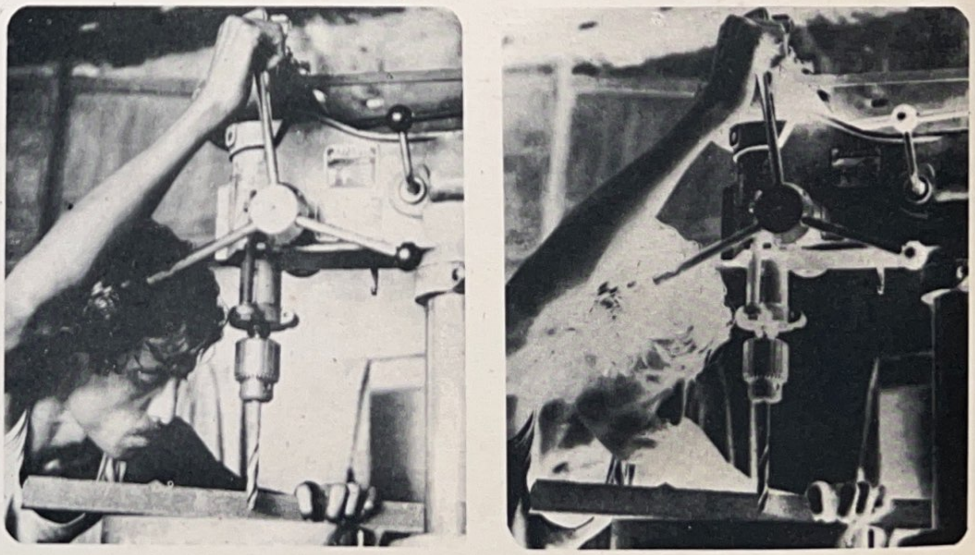

শ্রমিক

পরিচিত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পুনরাবৃত্তি না করে এই পর্যায়ের বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করে বলা চলে যে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালীস জমির খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে বাংলার কৃষকের উপর যে 'জমিদার শ্রেণীর' সৃষ্টি করল তার অধিকাংশ হিন্দু সমাজের। এই ব্যবস্থার বদৌলতে জমিদার শ্রেণীর জন্য জমি বিচ্ছিন্ন এবং সাক্ষাৎ উৎপাদন ব্যতীত সহজ সম্পদ সঞ্চয়ের পথ উন্মুক্ত হল। এই নূতন শ্রেণী এই সহজ এবং বিনাশ্রমলব্ধ সম্পদের সাহায্যে নবাগত বৃটিশ সভ্যতা ও সরকারের সৃষ্ট অর্থনীতিক. সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক এবং জীবিকার সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহারে অধিকতর সক্ষম হয়। মোট কথা এই নূতন শ্রেণী এবং এই শ্রেণী থেকে উদ্ভূত সম্প্রদায় অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এই কালে তাই পূর্ব বঙ্গের বৃহত্তর কৃষক সমাজে চেতনার কোন ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। ধর্মীয় যেসব মুসলিম নেতা উনবিংশ শতকে ইংরেজ বিরোধিতা কিংবা তৎসঙ্গে হিন্দু জমিদার বিরোধী ঘটনা কোন কোন এলাকায় সংঘটিত করে সে ঘটনাও ব্যাপকভাবে পূর্ব বঙ্গের কৃষক সমাজকে আলোড়িত করতে পারে নি এবং তার চেতনায় নূতন কোন উপাদানের যোগান দিতে সক্ষম হয় নি। বরঞ্চ তার প্রতিক্রিয়াশীল দিক এই যে, এ সমস্ত ঘটনা পূর্ব বঙ্গের কৃষক জনসাধারণের মনে ধর্মের বন্ধন অধিকতর দৃঢ় করতেই সাহায্য করে। এ পর্যায়ে পূর্ব বঙ্গের বৃহত্তর মুসলিম জনসমাজ আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচলনের চেষ্টা আদৌ কেউ করেন নি, এমন নয়। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে উচ্চবিত্ত বা মুসলিম ভূস্বামীদের মধ্য থেকে যাঁরা বৃটিশ শিক্ষা ও শাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ বঙ্গীয় মুসলমান জনসমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেন। কিন্তু উপযুক্ত অর্থনীতিক ভিত্তি ব্যতীত কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চেষ্টায় একটা জনসমাজের সর্বত্র একটা নূতন শিক্ষা ও চেতনা বিস্তারলাভ করতে পারে না।

কিন্তু এ কথা সত্য যে. পূর্ব বঙ্গের অশিক্ষিত. অনুন্নত, শোষিত কৃষক জনসমাজ যে একটা শক্তি—এ কথা আর কেউ উপলব্ধি না করলেও বাঙ্গালী মুসলিম সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী ও তার প্রতিভূগণ ক্রমাধিক পরিমাণে উপলব্ধি করতে লাগল। কারণ বন্ধ্যা ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভারত উপমহাদেশের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে তার জীবিকা, সম্মান ও শক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখতে শুরু করেছে। এ অর্থনীতিতে সবার বিকাশ সম্ভব নয়। তাই একদিকে যখন সচেতন অগ্রগামী মধ্যবিত্ত সমাজ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনীতিক অধিকারের দাবীতে সোচ্চার ও সংগ্রামী হয়ে উঠছে তখন অপরদিকে অনুন্নত বাংলার কৃষক সমাজের সঙ্গে ধর্মগত বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিম সামন্তবাদী শ্রেণী হিন্দু সমাজকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিজের স্বার্থকে বিপন্ন মনে করতে শুরু করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে 'বিভেদ ও শাসনে' সিদ্ধহস্ত বৃটিশ সরকার সামন্তবাদী সমাজের প্রতিভূদের কানে পরামর্শ দিলঃ "তোমরাও দাবী তোল। তোমরা বল তোমাদের মুসলমান সমাজ স্বাধীনতাকে ভয় পায়। কেননা স্বাধীন ভারতে তোমাদের নিরাপত্তা কোথায়?"

উপজাতি মেয়ে

আধুনিকা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ নৃত্য

এই পটভূমিতে ১৯০৫ সালে মুসলিম লীগের জন্ম। মুসলিম ভূস্বামী ও বিত্তবানদের প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে অধিকাংশ কেবল যে সামন্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন তাই নয়, তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন পূর্ব বঙ্গের বাইরের, ভারতের অপরাপর অঞ্চলের মুসলিম সামন্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের না মাটি, না বৃহত্তর জনতা, কারো সঙ্গেই শ্রেণীগত আর্থিক এবং আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না। দীর্ঘ ইতিহাসের সব ঘটনার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা সত্য, মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনে পূর্ব বঙ্গের মুসলিম জনতা ১৯৪০ সালের পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার নবোদ্ভূত মুসলিম শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত ছাত্রসমাজ ও নেতৃবৃন্দের আবেদন ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে যোগদান করলেও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের চরিত্রে শ্রেণীগত কিংবা অঞ্চলগত মৌলিক কোন রূপান্তর সাধিত হয় নি।

মুসলিম সামন্তবাদী শ্রেণী নিজের শক্তি প্রদর্শনের স্বার্থে, নিজের শ্রেণীগত স্বার্থ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষপুটে অধিকতর নিরাপদ রাখার প্রয়োজনে মুসলিম কৃষক সমাজের বরাত দিয়ে কথা বললেও তার একটা অনিচ্ছুক অবদান এই যে, মুসলিম লীগ মুসলিম কৃষক জনতা এবং তার সন্তান মুসলিম মধ্যবিত্তকে সংগঠিত করে তুলল। এর অনিবার্য পরিণাম ছিল এই যে, একদিন এই কৃষক সমাজ সামন্তবাদের প্রেমের শিকল ভেঙে ফেলবেই। একবার যখন ঘটনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটতে শুরু করেছে, যখন শুরু করেছে শহরের আচকান-জোব্বাধারী নবাব সাহেব, খান সাহেব তার ক্ষেত-খামারে আনাগোনা, একবার যখন তার দৈহিক যোগ ঘটে গেছে নূতন জগৎ ও জীবনের সঙ্গে, তখন তার চেতনা ধীরে হলেও পরিচ্ছন্ন হতে শুরু করবে। নিজের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার ধ্বনি সে অবশ্যই তুলতে শুরু করবে।

এই পরিণাম সম্পর্কে সচেতন ছিল মুসলিম সামন্তবাদী শ্রেণী; কৃষক ও শ্রমিক সমাজের এই নবচেতনার পরিণাম সম্পর্কে সচেতন ছিল হিন্দু সামন্তবাদী শ্রেণী; সচেতন হচ্ছিল ক্রমান্বয়ে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সহযোগী জাতীয় বুর্জোয়ার উপর অংশও। এবং সর্বোপরি সচেতন ছিল সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ চোখ-কান মুক্ত রেখেই বাতাসে নাক দিয়ে ভবিষ্যতের গন্ধ শুঁকছিল আর ক্রমান্বয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল।

সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ চাচ্ছিল বাংলার মুসলিম কৃষক সমাজকে ধর্মের বন্ধনে আটকে রাখতে। তাকে ধর্মীয় রাষ্ট্রের জোয়ালে আটকে দিয়ে তার অর্থনৈতিক এবং মানসিক বিকাশকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রুদ্ধ করে রাখতে। একদিকে যেমন শ্রেণীগতভাবে অসংঘবদ্ধ পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজ থেকে জাত নূতন মধ্যবিত্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না সামন্তবাদের ধর্মীয় এই কৌশলকে প্রতিরোধ করা, তেমনি অপরদিকে ঔপনিবেশিক বন্ধ্যা অর্থ-

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ নাট্যাভিনয়

নীতিতে সমগ্র উপমহাদেশ তখন উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক থেকে অন্যের বিশিষ্টতার ভিত্তিতে নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকেই প্রত্যেক সম্প্রদায় তার একমাত্র আদর্শ বলে প্রচারে ব্যস্ত। এই বিশিষ্টতার প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিকভাবে মুসলিম সামন্তবাদের নেতৃত্বে বাঙ্গালী মুসলিম মধ্যবিত্তও নিজের মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেই তুলে ধরতে শুরু করে। এই মোহবিস্তারের মাধ্যম হিসাবে মুসলিম লীগ মুসলিম স্বতন্ত্র দেশের আন্দোলনের নাম রাখে পাকিস্তান আন্দোলন। এই প্রসঙ্গে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল পাকিস্তানের প্রস্তাবে শর্তহীনভাবে এককেন্দ্রিক মুসলিম রাষ্ট্র-কাঠামো ঘোষণা করা। যে শঠতা দেশ বিভাগের সিদ্ধান্তের পরে দিল্লী কনভেনশনে জিন্না সাহেব লাহোর প্রস্তাবের শব্দগত ভুল বলে পূর্ব বাংলার উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন তা তিনি ১৯৪০ সালে করতে সাহস পান নি। কেননা এককেন্দ্রিক এবং দূর করাচী বা লাহোরকেন্দ্রিক পাকিস্তানী রাষ্ট্রের স্বপ্ন পূর্ব বাংলার জনতা এবং তার রাজনীতিক নেতা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীকে কিছুতেই আকর্ষণ কিংবা উদ্বুদ্ধ করতে পারত না। কূটবুদ্ধি জিন্নাহ সাহেব তাই পরিণাম এবং বাস্তব পরিস্থিতি ১৯৪০ সালেই উপলব্ধি করেছিলেন। এর কোনটাই আকস্মিক নয় যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পেশ করানো হয়েছিল পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং স্বভাবে চরিত্রে বাংলার কৃষকের ন্যায়ই উদার ও সরলপ্রাণ এ, কে, ফজলুল হককে দিয়ে। এবং আকস্মিক ব্যাপার কিংবা শব্দগত ভুল নয় যে, সেই প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছিলঃ পাকিস্তান এমনভাবে গঠিত হবে যাতে পূর্বাঞ্চলও তার একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবে।*

কাজেই দ্ব্যর্থহীনভাবে লাহোর প্রস্তাবে পূর্ব বাংলা তার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কামনা প্রকাশ করেছিল। লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই তাই প্রকাশ পেয়েছিল পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা। তার খোলস পাকিস্তান হলেও পূর্ব বাংলার আন্দোলনের আত্মিক চরিত্র ছিল জাতীয়তাবাদী। পূর্ব বাংলার মুসলিম জনসাধারণ এবং তার রাজনীতিক চেতনার বিকাশে এ এক গুণগত পরিবর্তনের স্বাক্ষর। এ প্রস্তাবে ঘোষিত হয়েছে পূর্ব বাংলার

---

* "....that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute 'Independent States' in which constituent units shall be autonomous and sovereign."

মুসলমান জনসাধারণের বিশিষ্ট আত্মপরিচয়ঃ আমরা মুসলমান এবং বাঙ্গালী। আমাদের রাষ্ট্র বাঙ্গালী রাষ্ট্র। বস্তুতঃ পূর্ব বাংলা এ রাষ্ট্রকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও 'পূর্ব পাকিস্তান' বা মুসলিম বলেও অভিহিত করতে চায় নি। সে যখন নিজেকে পূর্ব বাংলা বলে সগর্বে পরিচয় দিয়েছে তখন পাকিস্তানী শাসকচক্র তাকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করতে চেয়েছে। 'পূর্ব বঙ্গকে' 'পূর্ব পাকিস্তানে' পরিণত করার ষড়যন্ত্র একমাত্র তারা কার্যকরী করতে পেরেছে নানা ঘটন-অঘটনের পরে ১৯৫৬ সালে সামরিক শাসনের খড়্গ তুলে এবং এক ইউনিটের সৃষ্টি করে।

বস্তুতঃ ১৯৪০ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে পাকিস্তানী সামন্তবাদী শাসকচক্রের সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। জিন্নাহ সাহেব, লিয়াকত আলী এবং তাঁদের অনুসারীবর্গ লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। পূর্ব বঙ্গের চেতনা যে ক্রমান্বয়ে পূর্ব বঙ্গের জাতীয় সত্তা প্রতিষ্ঠার তীব্র আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করবে তা উপলব্ধি করতেও তাঁরা বিলম্ব করেন নি। তাই ১৯৪৬ সালের দিল্লী কনভেনশনে (আইন সভার সদস্যদের) বাংলার প্রতিনিধিদের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে লাহোর প্রস্তাবকে সংশোধন করে জিন্নাহ সাহেব এককেন্দ্রিক পাকিস্তানের কাঠামো গ্রহণ করেন।

পূর্ব বাংলার রাজনীতিক নেতৃত্বের জাতীয়তাবাদী চরিত্রের এ সাক্ষ্যও ভাস্বর যে, দেশ বিভাগের মুহূর্তে দিল্লী ও পাঞ্জাবে যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে তেমন আকারে কিছু ঘটে নি। একথা সত্য যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং তার তল্পীবাহক পূর্ব বঙ্গ সরকার সংগঠিতভাবে এর পরবর্তীকালে তার প্রয়োজন মত হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, হয় ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অজুহাতে কিংবা পূর্ব বঙ্গের কোন ঘটনায় ভারতে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে। কিন্তু একথা ইতিহাস-স্বীকৃত যে, সে ষড়যন্ত্রের শরীক ব্যাপক জনসাধারণ ছিল না। পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হিস্টেরিয়া ছিল না এবং শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনীতিক নেতৃত্ব, অর্থাৎ মুসলিম প্রগতিশীল তরুণরা অংশ গ্রহণ করেন নি।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়। আগষ্ট মাস থেকে পরবর্তী বছরের ফেব্রুয়ারী মাস মাত্র সাত মাসের ব্যবধান। কিন্তু এরই মধ্যে পাকিস্তানের সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসাধক শাসকগোষ্ঠীর আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে শুরু করল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গণপরিষদে মুসলিম লীগ সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। মুসলিম লীগের কেউ এর প্রতিবাদ না করলেও পূর্ব বাংলার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত** এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সংশোধনী উত্থাপন করেন। তাঁর সংশোধনী মুসলিম লীগ অগ্রাহ্য করে। কিন্তু পাকিস্তান গণপরিষদ আর পূর্ব বঙ্গের প্রতিনিধিত্বশীল গণপরিষদ ছিল না। পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণের মতের কোন প্রতিধ্বনি গণপরিষদের প্রস্তাবে যেমন থাকে নি, তেমনি সে গণপরিষদের কোন রায়কেই পূর্ব বঙ্গের জনতা স্বীকার করে নেয় নি। পূর্ব বাংলার জাতীয় সত্তা ইতিমধ্যেই চিন্তার পরিচ্ছন্নতা লাভ করেছিল। এবার পাকিস্তানী শাসকচক্রের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা সে সত্তাকে তার আত্মিক প্রত্যয়ে দৃঢ়তর করে তুলতে লাগল। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রস্তাবের প্রতিবাদে ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করলেন। ১১ই মার্চ তাঁরা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করলেন। ধর্মঘটের উপর নেমে এল পাকিস্তান সরকারের অনুগত প্রাদেশিক সরকারের দমননীতি। কিন্তু দমননীতি পূর্ব বাংলার মোহমুক্তিকে দ্রুততর করে তার চেতনাকে স্তর থেকে স্তরে উন্নীত করে তুলতে লাগল। ১৮ই মার্চ জিন্নাহ সাহেব—পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা বলে অভিহিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, চরিত্রে যিনি স্বৈরতান্ত্রিক, রাজনীতিতে যিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী—এলেন প্রথমবারের জন্য পূর্ব বংগ ভ্রমণে, যে পূর্ব বংগ লাহোর প্রস্তাবে ছিল সার্বভৌম আর যাকে তিনি দিল্লী কনভেনশনে পরিণত করেছিলেন প্রদেশে। তিনি ভাবলেন, তিনি যা বলবেন, তাই আইন। তাই অমোঘ। রেসকোর্সের ময়দানে তাই তিনি ২১শে মার্চ তারিখে বললেনঃ উর্দু এ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগোয়েজ অব পাকিস্তান। জনতাকে

**ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে পাক সামরিক বাহিনীর হাতে নিহত হন।

শহীদ মিনার—একুশের ডাকে

মুসলমান জনসাধারণের বিশিষ্ট আত্মপরিচয়ঃ আমরা মুসলমান এবং বাঙ্গালী। আমাদের রাষ্ট্র বাঙ্গালী রাষ্ট্র। বস্তুতঃ পূর্ব বাংলা এ রাষ্ট্রকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও 'পূর্ব পাকিস্তান' বা মুসলিম বলেও অভিহিত করতে চায় নি। সে যখন নিজেকে পূর্ব বাংলা বলে সগর্বে পরিচয় দিয়েছে তখন পাকিস্তানী শাসকচক্র তাকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করতে চেয়েছে। 'পূর্ব বঙ্গকে' 'পূর্ব পাকিস্তানে' পরিণত করার ষড়যন্ত্র একমাত্র তারা কার্যকরী করতে পেরেছে নানা ঘটন-অঘটনের পরে ১৯৫৬ সালে সামরিক শাসনের খড়্গ তুলে এবং এক ইউনিটের সৃষ্টি করে।

বস্তুতঃ ১৯৪০ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে পাকিস্তানী সামন্তবাদী শাসকচক্রের সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। জিন্নাহ সাহেব, লিয়াকত আলী এবং তাঁদের অনুসারীবর্গ লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। পূর্ব বঙ্গের চেতনা যে ক্রমান্বয়ে পূর্ব বঙ্গের জাতীয় সত্তা প্রতিষ্ঠার তীব্র আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করবে তা উপলব্ধি করতেও তাঁরা বিলম্ব করেন নি। তাই ১৯৪৬ সালের দিল্লী কনভেনশনে (আইন সভার সদস্যদের) বাংলার প্রতিনিধিদের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে লাহোর প্রস্তাবকে সংশোধন করে জিন্নাহ সাহেব এককেন্দ্রিক পাকিস্তানের কাঠামো গ্রহণ করেন।

পূর্ব বাংলার রাজনীতিক নেতৃত্বের জাতীয়তাবাদী চরিত্রের এ সাক্ষ্যও ভাস্বর যে, দেশ বিভাগের মুহূর্তে দিল্লী ও পাঞ্জাবে যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে তেমন আকারে কিছু ঘটে নি। একথা সত্য যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং তার তল্পীবাহক পূর্ব বঙ্গ সরকার সংগঠিতভাবে এর পরবর্তীকালে তার প্রয়োজন মত হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, হয় ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অজুহাতে কিংবা পূর্ব বঙ্গের কোন ঘটনায় ভারতে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে। কিন্তু একথা ইতিহাস-স্বীকৃত যে, সে ষড়যন্ত্রের শরীক ব্যাপক জনসাধারণ ছিল না। পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হিস্টেরিয়া ছিল না এবং শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনীতিক নেতৃত্ব, অর্থাৎ মুসলিম প্রগতিশীল তরুণরা অংশ গ্রহণ করেন নি।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়। আগস্ট মাস থেকে পরবর্তী বছরের ফেব্রুয়ারী মাস মাত্র সাত মাসের ব্যবধান। কিন্তু এরই মধ্যে পাকিস্তানের সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসাধক শাসকগোষ্ঠীর আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে শুরু করল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গণপরিষদে মুসলিম লীগ সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। মুসলিম লীগের কেউ এর প্রতিবাদ না করলেও পূর্ব বাংলার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত** এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সংশোধনী উত্থাপন করেন। তাঁর সংশোধনী মুসলিম লীগ অগ্রাহ্য করে। কিন্তু পাকিস্তান গণপরিষদ আর পূর্ব বঙ্গের প্রতিনিধিত্বশীল গণপরিষদ ছিল না। পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণের মতের কোন প্রতিধ্বনি গণপরিষদের প্রস্তাবে যেমন থাকে নি, তেমনি সে গণপরিষদের কোন রায়কেই পূর্ব বঙ্গের জনতা স্বীকার করে নেয় নি। পূর্ব বাংলার জাতীয় সত্তা ইতিমধ্যেই চিন্তার পরিচ্ছন্নতা লাভ করেছিল। এবার পাকিস্তানী শাসকচক্রের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা সে সত্তাকে তার আত্মিক প্রত্যয়ে দৃঢ়তর করে তুলতে লাগল। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রস্তাবের প্রতিবাদে ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করলেন। ১১ই মার্চ তাঁরা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করলেন। ধর্মঘটের উপর নেমে এল পাকিস্তান সরকারের অনুগত প্রাদেশিক সরকারের দমননীতি। কিন্তু দমননীতি পূর্ব বাংলার মোহমুক্তিকে দ্রুততর করে তার চেতনাকে স্তর থেকে স্তরে উন্নীত করে তুলতে লাগল। ১৮ই মার্চ জিন্নাহ সাহেব—পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা বলে অভিহিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, চরিত্রে যিনি স্বৈরতান্ত্রিক, রাজনীতিতে যিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী—এলেন প্রথমবারের জন্য পূর্ব বংগ ভ্রমণে, যে পূর্ব বংগ লাহোর প্রস্তাবে ছিল সার্বভৌম আর যাকে তিনি দিল্লী কনভেনশনে পরিণত করেছিলেন প্রদেশে। তিনি ভাবলেন, তিনি যা বলবেন, তাই আইন। তাই অমোঘ। রেসকোর্সের ময়দানে তাই তিনি ২১শে মার্চ তারিখে বললেনঃ উর্দু এ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগোয়েজ অব পাকিস্তান। জনতাকে

শহীদ মিনার—একুশের ডাকে

**ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে পাক সামরিক বাহিনীর হাতে নিহত হন।

আতঙ্কিত করার জন্য বললেনঃ দেয়ার আর কমিউনিস্টস এ্যান্ড ফিফ্‌থ কলামনিস্টস এ্যামংস্ট ইউ। কিন্তু পূর্ব বাংলার কৃষকের সন্তান নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ যুবশক্তি জিন্নাহ সাহেবকে পরোয়া করল না। তাঁর সম্বর্ধনার সাজসজ্জা তারা ক্ষোভে ক্রোধে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।২৪শে মার্চ কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেব আবার উচ্চারণ করলেনঃ উর্দু এ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগোয়েজ অব পাকিস্তান। যুবশক্তি তখনি উপযুক্ত গাম্ভীর্য আর মর্যাদার সংগে ঐক্যবদ্ধ ধ্বনি তুললঃ নো, নো, নোঃ না, না, না।

তারপরের ঘটনার ধারাবাহিকতা ইতিহাসে বিধৃত। সে ঘটনাপঞ্জী বাংলাদেশের আপামর জনতার মনে স্তরে স্তরে দাগ কেটে বসে গেছে। তার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

দূর থেকে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন। প্রশ্ন করেন, পূর্ব বাংলার যে মুসলিম জনসাধারণ পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছিল তাদের এত দ্রুত পাকিস্তানের উপর মোহমুক্তি ঘটল কি প্রকারে। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনতার চেতনা বিকাশের রাজনীতিক, ঐতিহাসিক এবং তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যিক পটভূমিকে যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে অনুধাবন করেছেন, তাঁরা জনতার এই উত্তরণে বিস্মিত হন না। এ তাঁদের প্রত্যাশিত। পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব বাংলার জনতার মোহ ছিল, এটা রাজনীতিকভাবে সত্য নয়। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ নিজের শক্তিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই ক্রমাধিক পরিমাণে উপলব্ধি করে আসছিল। ভারতে কোন পাকিস্তান তৈরী করে তার নিজের সত্তা প্রতিষ্ঠা করার কথা তার ভাবতে হয় নি। পাকিস্তানেরই প্রয়োজন পড়েছিল পূর্ব বাংলার জনতার বিপুল শক্তিকে নিজের দাবীর পেছনে সংগ্রহ করার। পূর্ব বাংলা চেয়েছিল নিজের জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্র। সে দাবীই সে ঘোষণা করেছিল লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে। তার চেতনার মধ্যে যেটুকু ছিল না তা হচ্ছে মুসলিম সামন্তবাদী শাসকের শ্রেণী চরিত্রের কপটতা আর নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টেই সে উপলব্ধি করেছে, সে প্রতারিত হয়েছে। আর তাই ১৪ই আগষ্ট থেকেই শুরু হয়েছে সেই প্রতারক শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম, তার সার্বভৌম জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সত্তা অর্জনের প্রত্যক্ষ, রক্তাক্ত সংগ্রাম। পূর্ব বঙ্গের জনতার জাতীয় চেতনা আকস্মিক নয়। চরিত্রগতভাবে সে প্রধানতঃ কৃষক। বিপুল তার সংখ্যা। সেই কৃষকের সন্তান কালক্রমে আবার সংগ্রামী শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। গরীব কিংবা নিম্নবিত্ত কৃষকের সন্তানই লেখাপড়া শিখে বুদ্ধিজীবী, কেরানী, কর্মচারী, শিক্ষকে পরিণত হয়েছে। ধর্মের ওপর অর অনুরাগ আছে। বিশ্বাস আছে। কিন্তু কেবলমাত্র কোন ধর্মীয় শ্লোগান তার বঞ্চিত জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি, পারে না—এ অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। আর তাই ধর্মনির্বিশেষে কৃষক আন্দোলনের এবং শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী যখন তার মুক্তির কথা বলেছে তখন সে তাকে বুকে টেনে নিয়েছে। তার জমিতেই ঘটেছে ১৯৪৫-৪৬ সালের গৌরবময় কৃষক সংগ্রাম তেভাগার রক্তাক্ত লড়াই। অল্পবিকশিত তার শিল্পাঞ্চলেও তারই শ্রমিক সন্তান সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া তৈরীর স্বপ্ন নিয়ে অত্যাচারীর বুলেটের আঘাতে হাসিমুখে জীবন দিয়েছে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তারই সন্তান ছাত্রসমাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধ্বনি তুলেছে, 'রশীদ আলীর মুক্তি চাই' বলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তির দাবীতে ধর্মতলার রাস্তায় সাম্রাজ্যবাদের রাইফেলের বুলেটে জীবন দিয়েছে, ঢাকার রাস্তায় সাম্প্রদায়িক শান্তির মোর্চা বার করেছে। নজরুল তারই বুকের বেদনাকে ভাষা দিয়ে কখনো লিখেছেনঃ 'নির্যাতিত মুসলমান তুই ওঠ্'; কখনো লিখেছেনঃ 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন? কাণ্ডারী দল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।' রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' '৪৭ সালের পূর্বেও তার মনে আবেগের সৃষ্টি করেছে। তাই পূর্ব বাংলার জনতা পাকিস্তানের মোহে আচ্ছন্ন ছিল, একথা বলা ঠিক নয়। আর তাই তার মোহমুক্তির দ্রুততা অপরের বিস্ময় কিংবা প্রশ্নের উদ্রেক করলেও কোন বাঙ্গালীর মনে কোন অপ্রত্যাশিত চমক তোলে নি বা পাকিস্তানের স্বপ্নভঙ্গের হতাশা সৃষ্টি করে নি।

পূর্ব বাংলার জনসাধারণের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব অর্জনের রক্তাক্ত লড়াই তাই ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চই শুরু হয় নি। ২৫শে মার্চ তার চরম অবস্থা। বাঙ্গালী জানতো এ সংকট মুহূর্তটি আসবেইঃ সে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ হোক আর ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরেই হোক। পাকিস্তানী শাসক চক্রও জানতোঃ এ দিনটি আসবেই, সে ২৫শে মার্চই হোক কিংবা ১৬ই ডিসেম্বরই হোক। তাই পাকিস্তানী শাসকচক্র আর আপোষ কিংবা নিস্তারের কোন পথ দেখে নি ওদের মনোভাব ছিলঃ অনিবার্য এ মুহূর্ত আসবেই যদি, তবে আর বিলম্বে কি লাভ। আসে তো আজই আসুক। এই মনে করেই ওরা ২৫শে মার্চই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার উপর সর্বরকম মারণাস্ত্র নিয়ে এক বর্বরতম হত্যাযজ্ঞে।

কিন্তু পূর্ব বাংলার জনতা এই আক্রমণে হতচকিত হলেও বিহ্বল হয়নি। কারণ জাতীয় মুক্তির লড়াই-এ রক্তদানের অভিজ্ঞতা তার নূতন নয়। সে রক্তদান '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীরও আগে শুরু হয়েছিল। পূর্ব বাংলার মানুষ বুকের রক্ত ঢেলেছে ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রামের মাদারসার কাটাখালে। সে রক্ত ঢেলেছে ১৯৪৯-৫০ সালে সিলেটের সানেশ্বরে, রাজশাহীর নাচোলে, ঢাকার বন্দীশালায়, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে। তার পুলিশ কর্মচারী পাকিস্তানী শাসকের বুলেটের মুখে জীবন দিয়েছে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতেই নয়। সে জীবন দিয়েছে ১৯৪৮ সালেরই রমজান মাসে খুনী আইয়ুব খাঁর হুকুমে লালবাগ দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে।***

কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার বিকাশে এবং তার সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সত্তা প্রতিষ্ঠার ২৪ বছরের কিংবা '৪০ সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সংগ্রামের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ চেতনার গতিশীলতা। এ চেতনা নিজেকে কখনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ কিংবা পুঁজিবাদী আঞ্চলিক আধিপত্যের জাতীয়তায় পর্যবসিত করে নি।

বাংলাদেশের গণআন্দোলনের পাকিস্তানী পর্যায়ে রাজনীতিক নেতৃত্বের প্রথম সারিতে মধ্যবিত্ত এবং ক্ষুদে বাঙ্গালী শিল্প মালিক থাকলেও এই মধ্যবিত্তের রাজনীতিক শিক্ষার পটভূমি তৈরী করেছে পূর্ব বাংলার মহৎ ঐতিহ্যময় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস। তাই বাংলাদেশের জাতীয়তার লক্ষ্য কোন স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরী নয়, স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরী। কোন দেশের সমাজতন্ত্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তৈরী হতে পারে না। সমাজতন্ত্রের শত্রু এবং প্রতিপক্ষ কেবল দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সে আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তারিত। সে যখন সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানে তখন আন্তর্জাতিক ঐক্য নিয়েই সে আঘাত হানে। সে তখন কোন রাজ্যের সীমানা মানে না, নিয়ম বা গণতন্ত্রের পরোয়া করে না। আর তাই কোন দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যদি নিজেকে সংকীর্ণ জাতীয় সত্তার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, তবে সে আন্তর্জাতিক শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেকে সকল আন্তর্জাতিক মিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন, একক এবং অসহায় করে রাখে। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের চোরাবালির বিপদকে জানে। পাকিস্তানী শাসকচক্রের ধর্মান্ধতার ষড়যন্ত্রকে সে ছিন্ন করেছে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিপদকেও সে একই শক্তি, দৃঢ়তা এবং দূরদৃষ্টির সঙ্গে অতিক্রম করে বাংলাদেশকে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশে রূপান্তরিত করবে, শ্রমজীবী জনতার মনে এ প্রত্যয়ে কোন দ্বিধা নেই।

***এ ঘটনার কথা আমরা খুব কম লোকই জানি। কিন্তু হত্যাকারী আইয়ুব খাঁ নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে এ-ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করতে লজ্জাবোধ করেন নিঃ "Trouble was brewing and finally broke out in Dacca on 13th July, 1948. I was on tour with Zakir Hossain who was then Inspector-General of Police. We were staying at a rest house in Mymensingh when I was rung-up from Dacca and told that the police had surrounded Government House and the Chief Minister's House. Some of them had been seen in front of the Civil Secretariat........The defensive position which the police force had taken up was in the middle of the city and there was danger of members of the public getting injured by covering fire......A company of 3rd and 8th Punjab Regiment was detailed....They had to cover some three hundred yards of open ground to get on to the defensive position. They advanced quickly and occupied the position. One or two police men, including the ring leader were killed"—(Ayub Khan : **Friends Not Masters,** P. 28).

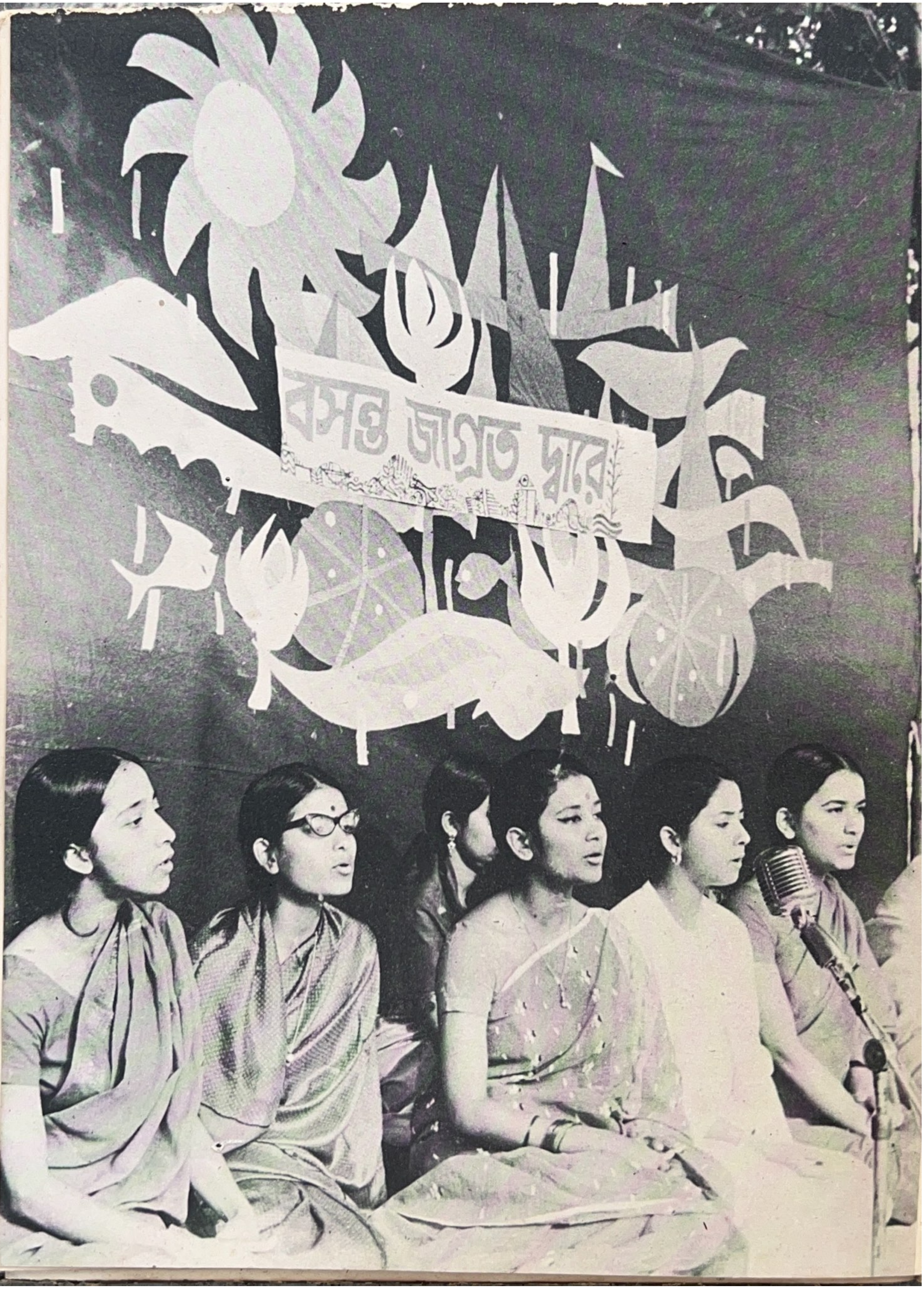
বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

বাঙ্গালী সংস্কৃতি

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর

সংস্কৃতি সমাজ-কাঠামোর অভিজ্ঞতা ধরে রাখে। অভিজ্ঞতার পটভূমিতে থাকে সামাজিক অবস্থা, ধ্যান-ধারণা ও দার্শনিক মনোভাবের জটিল সমাবেশ। ভাবনার জগতের উৎসলোক হচ্ছে অভিজ্ঞতার বিশাল বিচিত্র পটভূমি। সেজন্য অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র ঘটনারাশির সমাবেশ নয়, তার তথ্যাবলীতে ইতিহাস ও ভূগোলের ধারাবাহিক, এমন কি বিরোধী ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে: লুপ্ত, সুন্দর, স্মৃতি ভারাক্রান্ত সে-সব ইঙ্গিত সংস্কৃতির আভ্যন্তরিক ক্রিয়া, যার দরুন সংস্কৃতির ঐতিহাসিক একটা নক্সা গজে উঠে। সে-সব বিরোধী বিভিন্ন আভ্যন্তরিক ক্রিয়া হচ্ছে সংস্কৃতির ভিতর সংস্কৃতির নানা লক্ষণের নির্দেশ। নানা লক্ষণের নানা ছক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ছক গড়ে তোলে, সেজন্য সেই ঐতিহাসিক ছকে ধারাবাহিকতার সঙ্গে সঙ্গে থাকে পৃথক, বিচ্ছিন্ন, আকস্মিক উদ্ভাসন। তার কারণ খুব সম্ভব সংস্কৃতির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, যে-দ্বন্দ্বে কোন লক্ষণ স্পষ্ট, বিজয়ী, শক্তিশালী: কোন কোনটি বিশাল ছক থেকে বিচ্ছিন্ন, গতিবেগচ্যুত। অবশ্য সংস্কৃতিতে বিজয়ী লক্ষণ তীক্ষ্ম তরবারীর কাজ করে না, আপোশের পথে তার অভিসার, গতিবেগচ্যুত লক্ষণটিও হারিয়ে যায় না, ইতিহাসের কোন অনুকূল অবস্থায় তার প্রভাব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইতিহাসের কোন্ পর্যায়ে সংস্কৃতির কোন্ লক্ষণ তীব্র হয়ে দেখা দেবে সেটি নির্ভর করে সমাজ কাঠামোর ওপর। সমাজ কাঠামোর অনিবার্য প্রয়োজনে সংস্কৃতির বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট ও নিয়মবন্ধ হয়ে ওঠে। অন্যপক্ষে সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর সমাজ কাঠামোর দরুন সমান্তরালভাবে থেকে যেতেও পারে। সেজন্য অভিজ্ঞতার সমীকরণই সংস্কৃতি: সংস্কৃতির সূক্ষ্ম, গভীর, স্থূলসুলভ সব রূপই সমাজ কাঠামোর আভা। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই

সমাজ কাঠামোর আলোচনা সম্ভব এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বার্থ, ভাবনা ও ধারণার প্রক্রিয়া। সে-স্বার্থ, ভাবনা ও ধারণার প্রতিবেশ নির্ণীত করে মেটিরিয়াল কালচার, তার কার্যাবলীর ছক বেঁধে দেয় সমাজ। সমাজের গঠন ও কাজ তাই সংস্কৃতির নক্সা গড়ে তোলে। নক্সাতে থাকে বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও মনোজগতের অ্যাডভেন্‌চার। বাস্তবের অভিজ্ঞতায় সংস্কৃতির সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই তিন প্রত্যয় কাজ করে: মনে জগতে তার ব্যবহার অনুক্রমিক, কখনো-বা পারম্পর্যহীন। সম্বন্ধের ঐ জটিলতা ও বৈচিত্র্য সংস্কৃতির নক্সার কারুকাজ।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির নক্সা তার সমাজ কাঠামোর উপহার। ইতিহাস ও ভূগোলের প্রতিবেশে তার সমাজ কাঠামো সংস্কৃতির নক্সায় বহু বিচিত্র বিরোধী কারুকাজের জন্ম দিয়েছে। একই সংস্কৃতি অথবা বিভিন্ন সংস্কৃতি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, তার কারণ ব্যক্তির ভাবনাবৃত্তি পরিচালিত হয় গোষ্ঠীর নির্দেশে। গোষ্ঠী যে-সম্পর্কে সমাজ কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত, তাই তার মনোভাব। গ্রামীণ ও যন্ত্রনির্ভর সমাজ, দুইয়েতেই এ সত্য। গ্রামীণ সমাজ কাঠামো বাংলাদেশের সংস্কৃতির নক্সার যে-প্রতিবেশ তৈরী করেছে, সেই প্রতিবেশ আশ্রয় করেই যন্ত্রনির্ভর সমাজের দিকে বর্তমানে উত্তরণের প্রয়াস চলছে। 'মিথ' ও ধর্ম গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর কালপ্রত্যয়ের প্রাণ প্রতীক অথচ ধারাবাহিকতা হচ্ছে যন্ত্রনির্ভর সমাজের কালপ্রত্যয়ের প্রাণ বস্তু। সেজন্য দুটি বিপরীত কালপ্রত্যয় পাশাপাশি, কখনো-বা বিরোধী ভূমিকায় বর্তমানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি রচনায় কাজ করে চলেছে। ধারাবাহিকতার সঙ্গে মহাকাল, ক্ষণবাদ, কালচক্রবৎ-মিথ ও ধর্মের কালপ্রত্যয়ের প্রতীকের সমন্বয় সম্ভব নয়। সংস্কৃতির ঐতিহ্যে এ দুটি বিরোধী প্রত্যয়ের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অপরিসীম। গ্রামীণ মনোভাব, ধ্যান-ধারণা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান পরম্পরা, সেই সবগুলো আশ্রয় করে, কখনো আপোশ করে,

লোকশিল্পঃ মাটির পুতুল

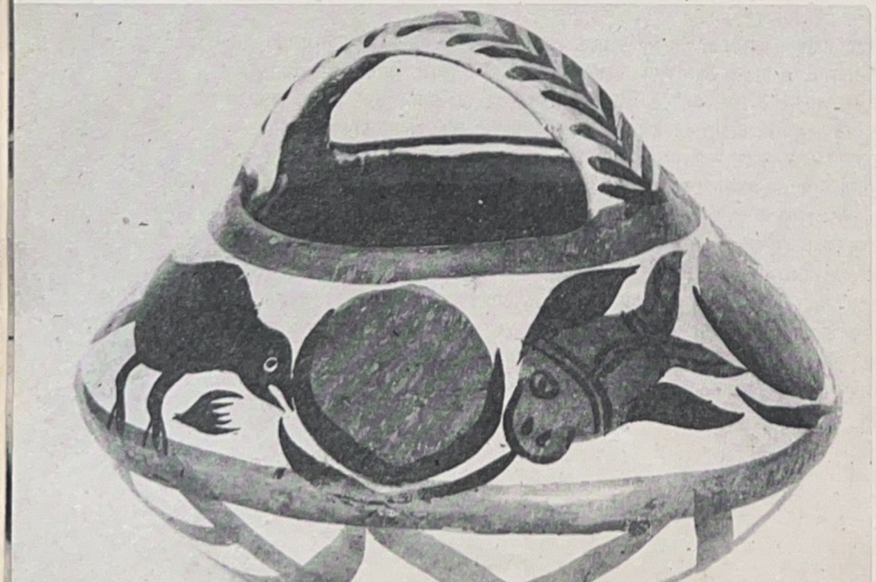

লোকশিল্পঃ সখের হাঁড়ি

কখনো-বা সমান্তরাল রেখে যন্ত্রনির্ভর সমাজের ধারাবাহিক কালপ্রত্যয়ের দিকে উত্তরণের প্রয়াস চলেছে। তার দরুন সংস্কৃতির গভীরতা ও প্রসারতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির তিনটি বৈশিষ্ট্য তার মনোজগতের অ্যাডভেন্চার নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য তার ভূগোল ও ইতিহাসের প্রতিবেশ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তার উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতা। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তার লোকজ উপাদানগুলোর সমান্তরাল অবস্থান।

ভূগোল ও ইতিহাস বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতিবেশ রচনা করেছে। বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র চিরকাল এক রকম থাকে নি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ প্রশ্নও ওঠেঃ বাংলাদেশে কারা বাস করে? কোন্ সময়কার বাংলাদেশে? অঙ্গ-বঙ্গ আমলের? পাল আমলের? পাঠান আমলের? মোগল আমলের? বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোন প্রশাসনিক সংজ্ঞা ইতিহাসের প্রথম থেকে না থাকার দরুন বাঙ্গালী নরগোষ্ঠীর মানসিকতায় নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমানা ছিল না। বাংলা ভাষার জন্মের পরেও প্রশাসনিক মানচিত্রের সঙ্গে তার ব্যবধান ঘোচে নি। অন্যপক্ষে বঙ্গ বা বাঙ্গালা শব্দের বিবর্তন তার চেতনার প্রতিবেশ চিহ্নিত করেছে। ইতিহাসের আদিতে বঙ্গ শব্দে যে-নির্দিষ্ট ভূখন্ড বোঝাত, কালক্রমে এমন এক বিশাল আয়তন সেই শব্দে চিহ্নিত হতে লাগল, যেখানে পরস্পর বিরোধী সংস্কৃতির স্তর কাজ করেছে। বিভিন্ন কৌম উদ্ভূত চেতনায় এক সঙ্গে গ্রথিত হল বঙ্গ শব্দের বিবর্তনগত মানসিক বিস্তৃতি। বিভিন্ন কৌম উদ্ভূত চেতনা যেহেতু সমাজ কাঠামোর অসম বিকাশের মাত্রায় এক স্তরে ছিল না, সেজন্য মানসিক বিস্তৃতিতে ঐক্য রচিত হলেও সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। আয়তন, জনসাধারণ ও বঙ্গ শব্দ মিলে বাংলা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বঙ্গ শব্দটি বাদে অন্য সব কিছু তার আয়তন, জনসাধারণ, সব কিছুরই পরিবর্তন কালক্রমে দেখা দিয়েছে। বঙ্গ শব্দটি সেজন্য স্মৃতি ভারাক্রান্ত। প্রশাসনিক মানচিত্র ও লোক পরম্পরাজাত স্মৃতির দ্বান্দ্বিক প্রতিবেশে বিভিন্ন কৌম যে-সমাজ কাঠামো তৈরী করেছে ও সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে সংস্কৃতির নানা বুনোন রচনা করে ধর্ম দর্শন মতবাদের যে-রূপ ফুটিয়ে তুলেছে তার মূল সুর শেষ অবধি এক। নানা স্তরের সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্ম দর্শন মতবাদের মূলগত ঐক্যের কারণ বাংলা সংস্কৃতির টেকনোলজিক্যাল উপাদানাবলী। সেই টেকনোলজিক্যাল উপাদানাবলী হচ্ছে বাংলা সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। সাংস্কৃতিক ঐক্য অবশ্য উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতার উপহার। বাঙ্গালী সংস্কৃতির আদিম-বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান পরম্পরায় মানসিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, এ সত্য, কিন্তু সে-পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে এবং সে-গন্ডী নির্ভর করেছে ঐ উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতার ওপরই। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর টেকনোলজিক্যাল উপাদান গতিশীল নয় বলে সেই সমাজের স্বার্থ, ভাবনা, ধারণার প্রতিবেশ স্থবির, পৌনঃপুনিক। পুনরাবৃত্তিতে বৈচিত্র্য নেই, ব্যক্তির ঐকান্তিক উপলব্ধি নেই, গতিহীনতার দরুন সৃষ্ট এমন সাংস্কৃতিক ঐক্য উদ্ভাবন ও প্রসারণেরও অন্তরায়। সমাজ কাঠামোর অসম ঐক্য সংস্কৃতির প্রসারণের গতি রুদ্ধ

লোকশিল্পঃ নক্সী কাঁথা

পুতুল

করে দিয়েছে, সেজন্য আঞ্চলিকতা বাংলার গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসাবে থেকে গেছে। সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যবধান ও অঞ্চলের দূরত্ব প্রকট বলে গ্রামীণ বাংলায় সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। বাংলার সংস্কৃতির এই প্রান্তিকতা বাংলা ভাষার ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। দরবার-কেন্দ্রিক ভাষার নক্সা বৌদ্ধ-হিন্দু আমলে সংস্কৃত ও মুসলমান আমলে বাংলার নক্সা সংস্কৃতের বুনোনের ওপর আরবী ফার্সীর কারুকাজে ভরা ছিল। দরবারী সংস্কৃতি কেন্দ্র করে এক ধরনের কৃত্রিম আধা নাগরিক ভাষা তৈরী করা হয়েছিল, সাহিত্যিক কনভেনশন হিসাবে যে-ভাষার মাহাত্ম্য উনিশ শতক অবধি ছিল টিকে। পুঁথির ভাষায় বিবৃত সেই সময়কার সাহিত্যকর্ম মনোভঙ্গির বিভিন্নতার অভাবে ক্লান্তিকর। অথচ পুঁথির ভাষার সমান্তরালে ছড়া, প্রবাদ, পালাগান, বারোমাস্যায় জনসাধারণের মুখের ভাষা যেভাবে টিকে আছে, তাতে পাওয়া যায় ভিন্নতর স্বাদ, সীমাবদ্ধ বৈচিত্র্য, স্পষ্ট তীব্র ব্যঙ্গ, জগৎ সংসার সম্পর্কে আশ্চর্য সজাগবোধ। পুঁথির ভাষায় রচিত সাহিত্যে ব্যক্তির অবলোপ উজ্জ্বল, সব পুঁথিকার শেষ অবধি বিষয় মাহাত্ম্যে খুব সম্ভব একজন বলে মনে হয়।

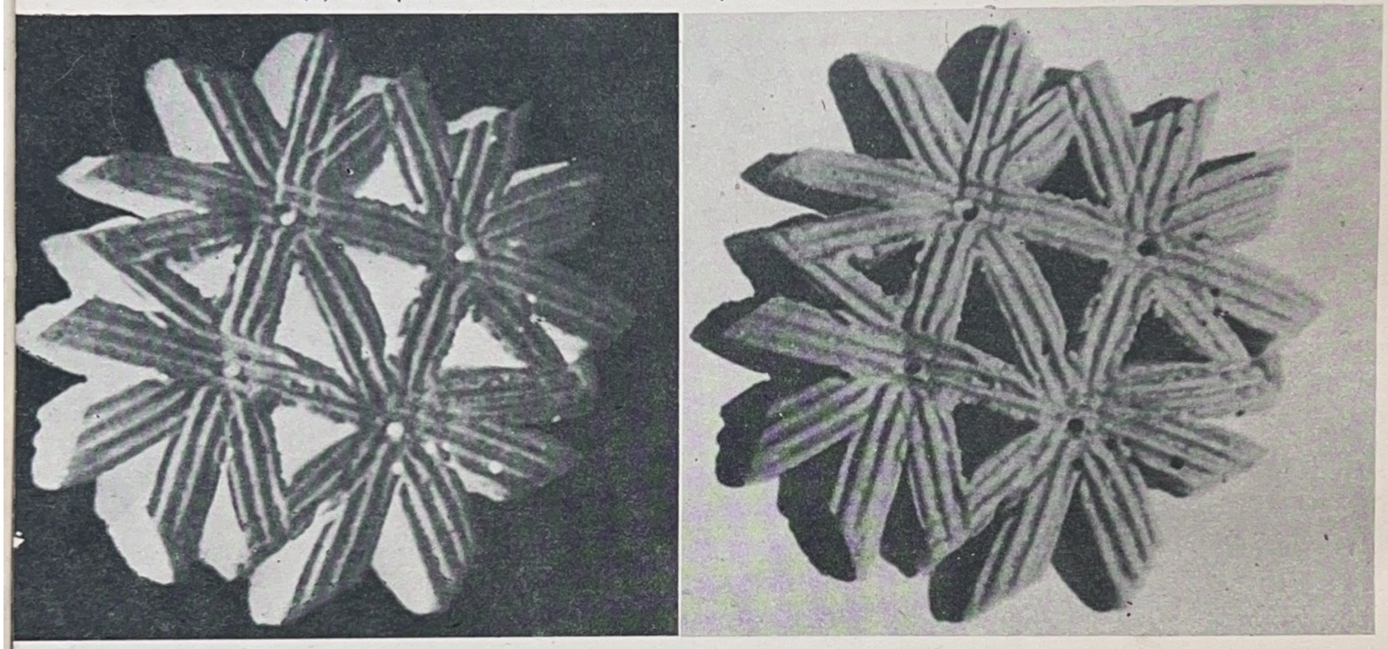
ঐতিহ্যবাহী পিঠার নক্সা

একপক্ষে দরবারী ভাষার পাশাপাশি লোকজ ভাষার অমন উপস্থিতি যেমন বাঙ্গালী সংস্কৃতির বহুল স্তরের স্মারণিক, অন্যপক্ষে সাহিত্যকর্মে বিষয় মাহাত্ম্যের অন্তরালে ব্যক্তিত্বের অবলোপ বাংলা সমাজ কাঠামোর গতিহীনতা ও উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতার ইঙ্গিতবহ। উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতার দরুন মঙ্গল কাব্য ও পুঁথিগুলোর মানস জলবায়ু একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে আবর্তিত হয়েছে এবং বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান ভাব পরম্পরা অর্থনৈতিক খর্বতার দরুন কৃষিজীবী সমাজে সংস্কৃতির অন্তর্মুখী পরিণতির নিয়ম মেনে বিভিন্ন তান্ত্রিক ও গুহ্য সাধন পদ্ধতিতে গিয়ে পর্যবসিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শক্তি ও লোকজ ইসলামের নানা পরিণতি শেষ পর্যন্ত কৃষিজীবী সমাজের আদিম যাদুবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের ফাঁপানো অন্তর্মুখী পর্যায়। বাউল সম্প্রদায় এমন সংস্কৃতির একটি প্রতিনিধি হিসাবে টিকে আছেন। নাথ ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অবধূতবাদও তাই, সহজিয়ারা আত্মসমর্পণ করেছেন বৈষ্ণব ধর্মের কাছে; কিন্তু বাউল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সাধন পদ্ধতিতে ঐ সব সম্প্রদায়ের প্রভাব ও আদিম কৃষিজীবী সমাজের নানা রেশ থেকে গেছে। যাদুশক্তি মুলমন্ত্র ও মন্ডল, ধরণী ও বীজ, লতা সাধনা, যন্ত্র সাধনা, ত্রয়ী নাড়ী সাধনা (বৌদ্ধ মতে ললনা, রসনা, অবধূতী; ব্রাহ্মণ্য মতে টড়া, পিঙ্গলা, সুচুম্না) সব কিছুই যাদু অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আঙ্গিক। অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হলে মানসিক বিকাশ যে-পদ্ধতিতে ঘটে, তারই ইঙ্গিত রয়েছে তন্ত্র অথবা বাউল সাধনায়। যাদুবিশ্বাসের অন্তর্মুখী বিকাশ বাউলমার্গ। বাংলা সংস্কৃতির লোকজ ভাবজগতের অন্তর্মুখী বিকাশের প্রতিবিম্ব বাউলপথ, তার ধ্যান-ধারণা দেহভান্ডের অনুরূপে যারা ব্রহ্মান্ডকে বোঝবার চেষ্টা করে থাকে। সেই দেহতত্ত্বে পুরুষ উদাসীন, নির্লিপ্ত, নিশ্চেষ্ট। অমন নির্লিপ্তির কারণ কি? পুরুষ কেনই-বা অপ্রধান, নিশ্চেষ্ট? বাউল পুরুষের অমন উদাসীন্যের মধ্যে মাতৃপ্রধান

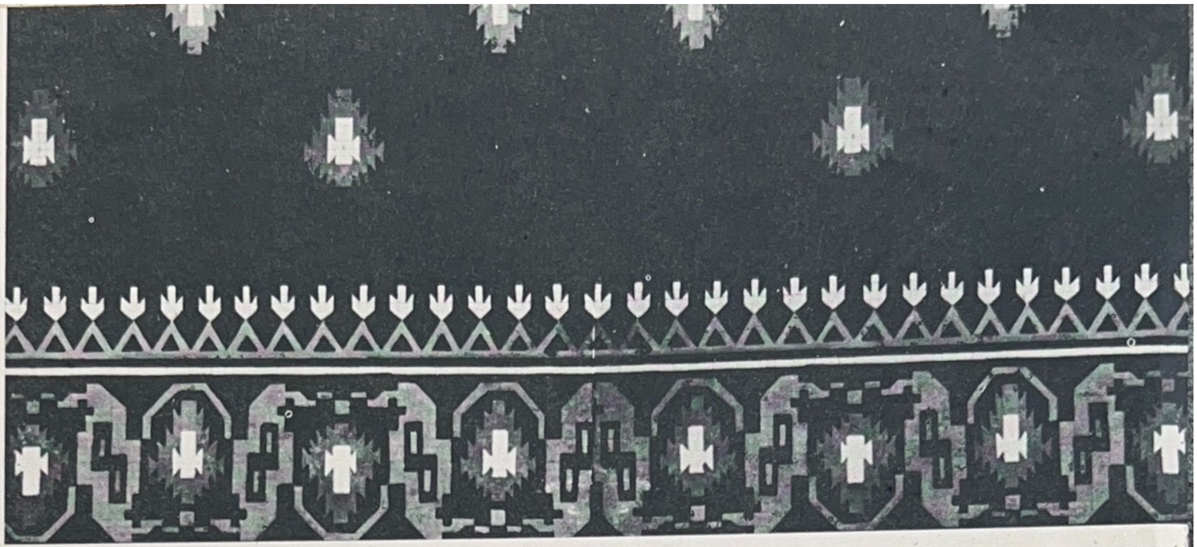

জামদানী শাড়ির নক্সা

সমাজের প্রতিবিম্ব অন্বেষণ করা যেতে পারে। বাউল মতবাদ যেমন একদিকে মাতৃপ্রাধান্যমূলক ধ্যান-ধারণার পরিচায়ক, ঠিক তেমনি কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়ের মৌলিক সমস্যার স্মারণিক। কৃষিমূলক অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা স্বভাবতই মাতৃপ্রধান বা নারীপ্রধান। এই নারীপ্রধান ধ্যান-ধারণার পরবর্তী বিকাশ হল বাউল মতবাদ: বাউল মতে প্রকৃতিই প্রধান, জগৎ বামোদ্ভূত। এই বামাচার বা বাউলাচার যাদুবিশ্বাসের বর্ধিত অংগ, তার মূল কথা হল প্রাকৃতিক উৎপাদনকে মানবীয় প্রজননের অনুকরণে আয়ত্তে আনবার সজ্ঞান চেষ্টা। আমাদের দেশের অসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশের দরুন সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষ কৃষিকাজের প্রাথমিক পর্যায় পিছনে ফেলে খুব বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারে নি। তাই সে-পর্যায়ের ধ্যান-ধারণা ও সাধন পদ্ধতির স্মারক বাউল সম্প্রদায়ের ভিতর অমন গভীরভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে।

বাংলার লোকজ সংস্কৃতির ভাবজগৎ বাউল মতবাদে যেমন কৃষিজীবী সমাজের বাধাপ্রাপ্ত বিকাশের ফলে অন্তর্মুখী ফাঁপানো ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি কৃষিজীবী সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতার দরুন মঙ্গলকাব্য ও পুঁথি সাহিত্যের ভাবপরিমণ্ডলে ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমী পরিস্ফুট। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর টেকনোলজিক্যাল উপাদানাবলী গতিশীল নয়। তার দরুন সে-সমাজের ভাবজগতের প্রতিবেশ স্থবির, পুনরাবৃত্তি একমাত্র বৈচিত্র্য, ব্যক্তি বিষয় মাহাত্ম্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে ক্ষান্ত। মুসলমান বিজয় বাংলার সমাজ কাঠামোয় যে-গতিবেগ এনেছিল তা কিন্তু ভাবজগতের উৎপাদন পদ্ধতির নয়। উৎপাদন পদ্ধতির স্থবিরতার দরুন বিষয়ের সীমাবদ্ধ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও পুঁথি সাহিত্যের পৌনঃপুনিকতা সমাজ কাঠামোর ইঙ্গিতবহ। পুঁথি সাহিত্যে যে-অভিজ্ঞতা বিবৃত তাতে দূর কোন দেশের স্মৃতি আছে, কিন্তু দেশের বাস্তবের অভিজ্ঞতা নেই, যদিও ব্যবহারে নায়কেরা মানবিক বাঙ্গালী। এই বৈপরীত্যের দরুন পুঁথি সাহিত্য লোকজ সংস্কার ও ধর্মবোধ জিইয়ে রাখার ব্যাপারে যতটুকু সাহায্য করেছে, কল্পনার চিহ্নিত সীমানায় চর্চার ফলে ক্রমশই একঘেয়ে ক্লান্তিকর অবাস্তব অলীক হয়ে পড়েছে। আত্মকেন্দ্রিক গ্রাম্য সমাজে বিষয়ের ঐ সীমাবদ্ধ কল্পনা প্রসারণ আশ্চর্য নিশ্চয়ই, কিন্তু সমাজ কাঠামোর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্যুতির দরুন পুঁথি সাহিত্য থেকে বলীয়ান কোন ভাবনা তরঙ্গ সৃষ্টি হয় নি। অন্যপক্ষে পুঁথি সাহিত্যের সীমাবদ্ধ কল্পনার বাহন হয়েছে কৃত্রিম আধা নাগরিক ভাষা, যে-ভাষায় সম্ভবত ক্যাভালিয়র সুলভ ভঙ্গি আছে। পুঁথি সাহিত্যের মানস ভ্রমরে নাগরোকোচিত বৈদগ্ধ থাকা সত্ত্বেও ভাবনার অনুবাদের দরুন বাস্তবিক অভিজ্ঞতা থেকে তার বহু দূরে অবস্থান শেষ অবধি তাকে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত করেছে।

বাংলার গ্রামীণ সমাজে সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভাবন ও প্রসারণ কিভাবে ঘটেছে? উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতার দরুন বাংলার সমাজ বিন্যাসে বহু স্তর সমান্তরালভাবে থেকে গেছে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান স্তরগুলির সমান্তরাল অবস্থানে সাহায্য করেছে। টেকনোলজিক্যাল স্থবিরতার দরুন ভৌগোলিক দূরত্ব থেকে গেছে, সেজন্য সাংস্কৃতিক প্রসারণ হতে পারে নি। উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতা সামাজিক দূরত্ব শক্তিশালী করেছে। সেই সঙ্গে এও সত্য যে, বিভিন্ন সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত ঘাতপ্রতিঘাত মিলন মিশ্রণ সমন্বয় সংস্কৃতি ইতিহাসের নক্সা তুলেছে গড়ে। হাজার মেলামেশাতেও যেমন বিভিন্ন জনস্তরের ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্বের জন্য মানসিক ব্যবধান অপসারিত হয় না, তেমনি, দুই বা ততোধিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য সংস্কৃতির নক্সায় জটিলতা ও সহস্র বৈচিত্র্য তৈরীও করে। কৃষিজীবী সমাজের আদিম যাদুবিশ্বাসের প্রতীক বাউল মতবাদ বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান মতবাদ প্রয়াস ও দার্শনিক মনোভঙ্গি স্বতন্ত্র করে রেখেছে। পরস্পর বিরোধী ধর্মীয় মনোভঙ্গি থেকে উৎসারিত নানা দার্শনিক প্রয়াস লোকজ সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী স্পর্শে বিপর্যস্ত

হয়ে যেরূপ ধারণ করেছে, সেই হচ্ছে শেষ অবধি বাঙ্গালী নরগোষ্ঠীর মানসিক উপাদানাবলী। দার্শনিক স্বাতন্ত্র্য ক্রমশঃ ক্ষয়িত হয়, তাদের সূক্ষ্ম সব কারুকাজে সময়ের হাত পড়ে, বিকৃতির পথ ধরে তারা আবার লোকজ মূলে ফিরে যায়। সংস্কৃতির লোকজ উপাদানের অমন তৃষ্ণার বুঝি শেষ নেই। নানা উপাদানের অন্তরঙ্গ সমান্তরাল অবস্থানে সে-ইংগিতই হয়তো লুকিয়ে থাকে।

সেজন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের পরস্পর বিরোধী অথচ অন্তরঙ্গ সমান্তরাল অবস্থান বাংলাদেশের সাংস্কৃতির তৃতীয় লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। লোকজ সংস্কৃতির ভাবজগৎ বাউল মতবাদ, সে-মতবাদ বাংলাদেশের যে-কটি অঞ্চলে প্রগাঢ়, সে-অঞ্চলের জনসংখ্যার অধিকাংশ পেশা তন্তুবয়ন। ধর্মে তারা হিন্দু অথবা মুসলমান, তাদের ধর্মপালনে লোকজ আদর্শ ও বিশ্বাসের পলি পড়া। যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, নরসিংদী, বাবুরহাট এলাকাতেই বাংলার বাউলদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী। এবং ঐ সব এলাকাতেই তন্তুজীবীদের সংখ্যাধিক্য। এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগ থাকাটা কোন দূর কল্পনা নয়। বাউলদের সঙ্গে তাঁতীদের সম্পর্কের ভিতর লুকিয়ে আছে ইতিহাসের বিলুপ্ত কোন অধ্যায়ের ইংগিত। বাউল মতবাদের ভাবাকাশ যে-সব জটিল ও দীর্ঘায়িত ধ্যান-ধারণার বিন্যাসে পরিপূর্ণ, তাদের ভিতর নাথ ধর্ম অন্যতম। বিস্মৃত সেই নাথ ধর্ম বাউলদের সাংকেতিক সব রীতিকরণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঐ সব এলাকার তাঁতীদের যুগী বা জোলা পদবীর আশ্রয়ে সহস্র পরিবর্তনের ভিতরে প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়েও বুঝি বেঁচে আছে। নাথ ধর্মের মতে মানুষের দুঃখের মূল তার অপক্ক দেহ। দেহযোগ হচ্ছে অগ্নি, সেই অগ্নিতে দেহ পরিশুদ্ধ করে নিলে সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহের অধিকারী হওয়া যায়। ঐ পথেই অমরত্ব লাভ সম্ভব। ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক শক্তি ধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উত্থানের দরুন নাথ ধর্ম ও সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে নি। পরাজিত নাথ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের নীচের পংক্তিতে স্থান পেল। নাথ যোগীদের জাত হল 'যুগী', বৃত্তি নির্ধারিত হল তাঁত বোনা। নামের পদবীতে নাথ শব্দ শেষ অবধি থাকল টিকে। মুসলমান যারা হল তাদের সামাজিক পদমর্যাদা নির্ধারিত থাকল কিন্তু ঐ স্তরে, পেশারও কোন পরিবর্তন হল না। বাংলাদেশের বিশাল ঐ এলাকা জুড়ে বাউলরা ঘুরে বেড়ায়, গান করে দেহতত্ত্বের, যারা শোনে তারা কৃষিজীবী সমাজের মানুষ, তাঁত বোনা তাদের পেশা। আর বাউল গানের নানা পদে প্রতিধ্বনিত সেই সব ভ্রষ্ট স্মৃতি, স্বপ্নের ভগ্নাংশ, চিন্তার শিহরণ, যেখানে পরস্পরে প্রবিষ্ট কৃষিজীবী সমাজের মৌলিক সমস্যার স্বীকৃতি ও সেই সমস্যার ইন্ধনে ভাস্বর নানা রূপকল্প, যে-রূপকল্প দেহ নিঃসৃত, দেহ ছাড়িয়ে কখনো যায় না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নাগারচি বলে একটি সম্প্রদায় আছে। নাচগান তাদের পুরুষানুক্রমিক পেশা। ধর্মে তারা মুসলমান, রীতিকরণে হিন্দু, জীবনচর্যায় আদিম। মুসলমান সমাজে তারা অপাংক্তেয়, হিন্দু সমাজে তারা কেউ নয়। তাদের মেয়েরা শাখা সিঁদুর পরে, তারা ঊর্ধ্বে আল্লাহ নীচে মাতা বসুমতী শপথ বাক্য উচ্চারণ করে গানের আসর বসায়। নানা সংস্কৃতির প্রবাল দ্বীপ তারা, নানা রীতিকরণ তাদের আচার-ব্যবহারে স্তরে স্তরে থেকে গেছে।

আবার চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে নানা ধারা-উপধারা ও উপাদানের মিশ্রণ ঘটেছে। যারা মুসলমান তাদের ভাষা ব্যবহারের মূল শব্দ সম্ভারে আরবী-ফার্সী-পর্তুগীজের কারুকাজ সত্ত্বেও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ইংগিতবহ; অন্যপক্ষে শিক্ষিত বড়ুয়া ও হিন্দুদের শব্দসম্ভার হিন্দু ঐতিহ্যে সংলগ্ন। তার কারণ এও হতে পারে যে, নানা কারণে বৌদ্ধদের বিরাট অংশের ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও বীজের মতো অবিচ্ছিন্নভাবে তাদের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহন করে চলা।

স্থাপত্যের দিক থেকে লোকজ প্রভাব, দেশজ ঐতিহ্য ও মনোভঙ্গিও বিশ্লেষণযোগ্য। মুসলিম স্থাপত্যের বৃত্তাকার কম্পোজিশনের প্রতি পক্ষপাত খুব সম্ভব আকস্মিক নয়। ফিগরের প্রচলন অননুমোদিত বলে আলঙ্কারিক নক্সার ব্যবহার তার একটা কারণ নিশ্চয়ই। ছাতের কি আলশের একটানা সোজা রেখা একঘেঁয়ে ও চোখে ক্লান্তি আনে বলে ব্যালাস্ট্রেডের গোল পদকের ব্যবহার জরুরী হয়ে পড়েছে। ফলে তৈরী করা হয়েছে বৃত্ত, খোপ, কখনো-বা গোলাপ, সূক্ষ্ম কারুকাজে ঐশ্বর্যময় এবং এ গোলাপ গূঢ়, মরমী, সুফীতত্ত্বের প্রতীক। এই বৃত্তাকার বা মরমী গোলাপ গূঢ় ইংগিতবহ, পাপড়ি পেরিয়ে কেন্দ্রে যেতে হবে, ধ্যান ও আরাধনা তার উপায়। স্তরে স্তরে পাপড়ি ভেদ করে গেলেই মিলন, প্রেমের রসাভাস যেন ঈশ্বরের সঙ্গে মরমী আত্মার। এই তত্ত্বটি লোকজ ঐতিহ্য সংলগ্ন, মন্ত্র, মণ্ডল, ধরণী, বীজ, ঐ সমস্ত ধ্যান-ধারণারই সংস্করণ মাত্র। বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলের অথবা তারও আগের সহস্র দল পদ্ম ঐ মরমী গোলাপের পূর্বরূপ, ঐ গোলপদক বা পদ্ম বা গোলাপ বুঝি ভ্রূণস্থ বীজের মত, গোপন কোন কেন্দ্র, যেখানে স্তরে স্তরে যেতে হয়। বাউল গানে, নানা তন্ত্রে, বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির যে-ধ্যান ধারণার বিকাশ, অন্য মাধ্যমে সেই মনোভাবেরই প্রতিফলন, ঐ সব স্থাপত্য রীতিতে তারই জের।

বাংলাদেশ: স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

রাষ্ট্রীয় সাফল্যের পরীক্ষাক্ষেত্র হচ্ছে জনসাধারণের জীবন। সেইখানে, জনসাধারণের জীবনে, রাষ্ট্র কোন শুভ পরিবর্তন কতটা আনতে পারল তার উপরই রাষ্ট্রের সফলতা-বিফলতা নির্ভরশীল। এই পরীক্ষায় রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, বিশেষ করে বাংলাদেশে। এবং এই ব্যর্থতার মধ্যেই নিহিত ছিল পাকিস্তানের মৃত্যু। বাংলাদেশের যে জনসাধারণ একদিন ভোট দিয়ে পাকিস্তান এনেছে, সেই জনসাধারণই আবার হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। দিয়েছে এই কারণে যে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের যে আশা নিয়ে তারা পাকিস্তান এনেছিল, সেই আশা পূর্ণ হয় নি। বরং উল্টোটা হয়েছে, দিনে দিনে পাকিস্তান সাধারণ মানুষের দুর্গতিকে বাড়িয়ে তুলেছে। দিনে দিনে তাই অসন্তোষ বেড়েছে, বেড়েছে বিক্ষোভ, পরিণতিতে পাকিস্তান শেষ হয়ে গেছে।

দেশের বুদ্ধিজীবীরা যে পরিমাণে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের সংগে নিজেদের স্বার্থকে যুক্ত করতে পেরেছেন সেই পরিমাণেই তাঁরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে তুলতে। কিন্তু বলাই বাহুল্য বুদ্ধিজীবী সমাজের সকল মানুষ সকল সময়ে সাধারণ মানুষের সংগে থাকেন নি। তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন নিজেদের স্বার্থকে জনসাধারণের স্বার্থ থেকে স্বতন্ত্র হিসাবে দেখে। এটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে। বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এদেশের উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিরদিনই আত্মস্বার্থ সচেতন। তরুণ বয়সে আত্মত্যাগের সাহস থাকে, পরিণত বয়সে আসে বিষয়বুদ্ধি। তাই পরিণত বয়সের বুদ্ধিজীবীরা স্বভাবতঃই সজাগ ছিলেন, ছিলেন আত্ম-সচেতন। এর আরো একটা কারণ ছিল। উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত্তি ছিল অর্বাচীন ও দুর্বল। তাই এই শ্রেণীর লোকদের পক্ষে কোন ঝুঁকি নেওয়া কঠিন ছিল। পার্টিশনের আগে মুসলমান মধ্যবিত্তরা দেখেছিল অবিভক্ত বাংলার তুলনায় অধিকতর পুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের সংগে প্রতিযোগিতার কারণে তাদের নিজস্ব শ্রেণীগত বিকাশের সুযোগ খুব সংকীর্ণ; আশা ছিল পাকিস্তানে সেই বিকাশ অনেক সহজ ও দ্রুত হবে। পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠিত হবার পর মধ্যবিত্তদের মধ্যে তাই একটা ব্যস্ততা দেখা গিয়েছিল নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার। বুদ্ধিজীবীরাও ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সুবিধা যতটা আশা করা গিয়েছিল ততটা পাওয়া যায় নিঃ সুযোগ অবাধ হয় নি, কিছুটা দ্রুত হয়েছিল যদিও। হিন্দুরা চলে যাওয়ায় চাকরি খালি হয়েছিল, সেইগুলো পাওয়া গেল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। হিন্দু মধ্যবিত্তের জায়গায় নতুন প্রতিযোগী এসে জুটেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত, যারা আগে থেকেই অনেকটা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য তো বটেই বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের প্রধান যে অবলম্বন চাকরি, সেই চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে শুধু শক্তিশালী প্রতিযোগী হয়ে দেখা দিল তা নয়, চাকরির তারা মালিকও হয়ে রইল। ছোট বড় সব রকমের চাকরির। স্পষ্ট সত্য হয়ে দাঁড়াল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের অসন্তুষ্ট করলে জীবিকার্জনের পথ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে, তুষ্ট করলে উন্নতি কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। প্রধানতঃ এই অর্থনৈতিক কারণেই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, সরে গিয়ে পাকিস্তানের গুণগানে ব্রতী হয়েছিল। এই কাজ করে তা'দের লাভ হয়েছে—ব্যক্তিগতভাবে। তা'ছাড়া সামনে প্রত্যাশার একটা দিগন্তও দেখা যাচ্ছিল।

বুদ্ধিজীবীদেব প্রলোভন দেখানোর কাজ পাকিস্তান সরকার শুরু থেকেই করেছে। উদ্দেশ্যটা সহজ। সরকার চেয়েছে জনসাধারণকে শোষণ করতে, বুদ্ধিজীবীরা যদি জনসাধারণের অংশ হয়ে যায়, জনসাধারণের সঙ্গে থাকে, তবে তারা মানুষের চোখ খুলে দিতে পারে, চোখ খুলে দিলে শোষণ করতে অসুবিধা। আর যদি বুদ্ধিজীবীদেরকে দিয়ে পাকিস্তানের মহিমা প্রচার করানো যায় তাহলে শোষণ কার্যটা আরো নির্বিঘ্ন হতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের জীবনে যেহেতু অভাব ছিল সচ্ছলতার এবং লোভ ছিল স্বাচ্ছন্দ্যের তাই অল্পতেই তাঁরা আকৃষ্ট হতেন। চাকরিতে উন্নতি, পুস্তকের জন্য পারিশ্রমিক পরবর্তীকালে তমঘা ও পুরস্কার, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ এ-সবের সাহায্যে জনসাধারণ থেকে বুদ্ধিজীবীদেরকে বিচ্ছিন্ন করবার প্রয়াস সরকার করেছেন, সক্ষমও হয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে। বুদ্ধিজীবী সমাজের, লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবহারজীবী এ'দের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁদের প্রায় সকলের জীবনেই সমৃদ্ধি এসেছে। তাই পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতাবোধ না থেকে পারে নিঃ তাঁদের জীবন ও সাধারণ মানুষের জীবন বিপরীত দিকে চলেছে, অনিবার্যভাবেই। তুলনায় যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন কম তাঁদের পক্ষেও সরকারী বক্তব্য সমর্থন না করে উপায় থাকে নি। এর কারণ তাঁদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাবোধের অভাবটা ছিল আরো বেশী, তাঁরা ভয় পেয়েছেন যে সামান্য ধাক্কাতেই তাঁরা গড়িয়ে পড়বেন নীচের খাদে। এবং ধাক্কার আশঙ্কা সব সময়েই ছিল—সরকার শুধু প্রলোভনই দেখায় নি, ভয়ও দেখিয়েছে। এবং প্রলোভনের তুলনায় ভয় কিছু কম শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেনি। ভয়ের জন্য ভুলকে ভুল, অন্যায়কে অন্যায় বলে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। মধ্যবিত্তের মনেও অর্থনৈতিক অসন্তোষ ছিল, কিন্তু সেই অসন্তোষ, কিম্বা তার চেয়েও বড় অসন্তোষ, সাধারণ মানুষের অসন্তোষকে উন্মোচিত করার মত পর্যাপ্ত সাহস বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায় নি। ভয়টা কল্পিত ভয় ছিল না। বামপন্থী বলে পরিচিত যাঁরা প্রয়োজনবোধে তাঁদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সরকাব দ্বিধা করে নি। অন্যদিকে অবাধে চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ বা স্বাধীনতা কোন দিনই ছিল না বাংলাদেশে। যেমন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশের কথা উল্লেখ করা যায়। এমনিতেই এই কাজটা দুরূহ ছিল, অর্থনৈতিক কারণে। তদুপরি পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে আগে অনুমতি নিতে হত সরকারের। সরকারের অপছন্দ হলে চালু পত্রিকা যে-কোন সময়ে বন্ধ করা হত। সম্পাদককে কারাদন্ডাদেশ দেবার উদাহরণও অজানা নয়।

প্রলোভন ও ভীতির সাহায্যে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার কাজ পাকিস্তান আমলে অবিরাম চলেছে, এবং সফলতাও এসেছে—এই দরিদ্র দেশে, ভয়ের দেশে। তবে প্রলোভন ও ভীতির বাইরেও, পাকিস্তান যে একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র এই রকম কথা কেউ কেউ বলেছেন নিজেদের বিশ্বাস থেকে। এরা হচ্ছেন আল-বদর বাহিনীর শিক্ষাগুরু। ভুল শিক্ষার কারণে, সংস্কারের বশে, প্রচলিত ধারণার প্রভাবে এরা ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা নামে একটি বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরীক্ষাস্থল হিসাবে পাকিস্তানকে কল্পনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে এমন কি সাধারণ মানুষের দুঃখে দুঃখিত মানুষও ছিলেন, তাঁরা সমাজতন্ত্র চাইতেন, কিন্তু বলতেন এ হবে ইসলামী সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ ভয় যে একেবারে ছিল না তা নয়, ছিল অন্য এক ভয়, ঈশ্বরহীনতার ভয়। এই বিশ্বাস গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। গোঁড়ামি থেকে জন্ম হয়েছে আল-বদরের। সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু ইসলামের মায়া এসে এ'দের চিন্তাকে দূর আরবের এমন একটা মনগড়া রাজ্যে নিয়ে গিয়েছে যেখান থেকে ফিরে আসা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। তাঁদের বুদ্ধিজীবী কর্মসমূহ গণবিরোধী, অর্থাৎ বাংলাদেশ বিরোধী, শক্তিকেই পুষ্ট করেছে।

কিন্তু বিভ্রান্তি আরো ছিল। বিভ্রান্তি ছিল উদ্দেশ্যহীনতার, ছিল তথাকথিত আধুনিকতার। ইসলামী আদর্শের অনুসারীরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, তুলনায় তরুণ যারা তাঁদের একাংশ এই দ্বিতীয় বিভ্রান্তির

করতলগত হয়েছেন। আর উভয় বিভ্রান্তির পেছনে হাত ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের। পাকিস্তানবাদীরা ভীষণ জোরে বলেছেন যে পাকিস্তানের পুণ্য মাটিতে বিদেশী সংস্কৃতি ও আদর্শের কোন স্থান নেই। বলাবাহুল্য, বিদেশী সংস্কৃতি বলতে বোঝান হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিদেশী আদর্শ বলতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ। বিদেশী সংস্কৃতি বলতে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিকে, বিদেশী আদর্শ বলতে ধনতন্ত্রের আদর্শকে এঁরা প্রায় কখনোই বোঝান নি, বরং সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের প্রভাবকে বিশেষ আদরের সঙ্গে স্বাগত জানান হয়েছে। পত্র-পত্রিকায়, চলচ্চিত্রে, বেতারে, টেলিভিশনে, সভা-সমিতিতে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মাহাত্ম্য প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে অবাধে। ফলে এই অতিদরিদ্র ও ভয়ঙ্কর অনগ্রসর দেশে বিলাসের অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম যেমন এসেছে তেমনি, সঙ্গে সঙ্গে, এসেছে এমন একটা জীবনদৃষ্টি যার পরিচয়চিহ্ন হচ্ছে উদ্দেশ্যহীনতা, জীবন-বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নগ্নতা। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বিলাসের উপকরণসমূহ কিছু কিছু পেয়েছেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশী পেয়েছেন ঐ জীবনদৃষ্টি, বলা যায় ওর জালে তাঁরা আটকা পড়েছেন। সংস্কারাচ্ছন্ন আলবদর ও সংস্কারহীন অত্যাধুনিকে খুব বড় একটা মিল আছেঃ উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে প্রতিপালিত, উভয়েই দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন শুধু নয় সাধারণ মানুষের প্রতি বিদ্বিষ্টও বটে।

[দুই]

আমরা বুদ্ধিজীবীদের একাংশের কথা বললাম। কিন্তু এই অংশেরও সকল সদস্য সকল সময়ে যে সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধিতা করেছে তা নয়। যখন তারা বিরোধিতা করেছে তখন তার ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিপদগ্রস্ত হয়েছে ঠিক কিন্তু তাদের সেই কাজের ফলে জনতার মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে জনতার স্বার্থ আবার এগিয়েও গেছে। কাজেই বিচ্ছিন্নতার যে-ধারার কথা বললাম সেই ধারাও অনেক সময় নেতিবাচক উপায়ে, অপ্রত্যক্ষরূপে, নিজের অজান্তেই স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশের আন্দোলনের অগ্রগামিতাকে সহায়তা দান করেছে।

বুদ্ধিজীবী সমাজের অন্য যে অংশ জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে এক করে দেখতে পেরেছেন তাঁদের কাজে স্বাধীনতার আন্দোলন লাভবান হয়েছে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে। এই অংশটিই ছিল বৃহত্তর অংশ, এবং এই অংশের বৃহত্তর অংশ এসেছিল তরুণ সমাজের মধ্য থেকে। তাঁরা তরুণ ছিলেন বলে তাঁদের মধ্যে একটা নবীন আদর্শবাদ ছিল, ছিল প্রলোভন এবং ভীতির কাছে আত্মসমর্পণ না করবার সাহস। তদুপরি পূর্ববর্তীদের তুলনায় এঁদের অর্থনৈতিক ভিত্তিটাও ছিল কিছুটা শক্তিশালী।

জনসাধারণের আশা পূরণের ক্ষেত্রে পাকিস্তান যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে তার প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়েছিল ১৯৪৮ সালে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অবশ্যি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেও দেশের সকল বুদ্ধিজীবীই যে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। ঢাকাতেই বুদ্ধির মুক্তি নামে একটি ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়ে। এঁরা সংস্কারমুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার উপর গুরুত্ব দিতেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও এঁদের মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন উঠেছিল। নজরুল ইসলামকে নিয়ে পাকিস্তানবাদীরা পরবর্তী কালে অনেক বাগাড়ম্বর করেছে, কিন্তু নজরুল ইসলাম কোনদিনই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না, তিনি বরং আস্থা রেখেছিলেন শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে। এটা আগের কথা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে, এমন কি যাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যে মঙ্গলের প্রত্যাশা দেখেছিলেন তাঁরাও কিছুটা চিন্তিত না হয়ে পারেন নি। চিন্তিত হয়েছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুকে চালু করবার উদ্যোগ-আয়োজন দেখে। ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকেই অধ্যাপক ও ছাত্রদের একাংশ দাবী তুললেন অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার পক্ষে। সরকারের দিক থেকে বিরোধিতা এল, প্রত্যাশিত বিরোধিতা। এবং তখনি, সেই সময়েই পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের জায়গায় নতুন এক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটল, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের। ঘটনাটা তেমন কোন ঘটা না করেই ঘটল। অধিকাংশ মানুষই লক্ষ্য করল না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য যে কি, এ যে কোন পর্যন্ত যাবে সেটা শাসকেরা তখন বোঝে নি, এমন কি তাঁরাও বোঝেন নি যাঁরা শুরু করেন এই আন্দোলন।

পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের যখন জন্ম হয় তখন সেই জন্মের পেছনে একটি অতিপ্রধান ভূমিকা ছিল ভয়ের। মুসলিম মধ্যবিত্ত ভয় পেয়েছিল অবিভক্ত ভারতে তাদের ভবিষ্যৎ নেই মনে করে। সেই ভয় তাঁরা সংক্রমিত করে

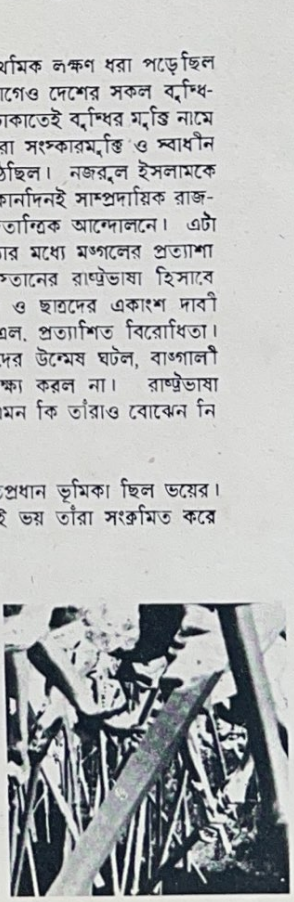

দিয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে। প্রধানতঃ ভয়ের কারণেই—ইংরেজের ভয়, তারো চেয়ে বড় ভয় হিন্দুর—ভয়ের তাড়নাতেই মুসলমানদের প্রায় সব ভোটই গিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানের বাক্সে। এখন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই এল এই নতুন ভয়—উর্দুর অর্থাৎ উর্দুভাষাভাষীদের। আশংকা হল উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ফলে বাঙ্গালীরা চিরকালের জন্য বোবা হয়ে যাবে, তারা গোলাম হয়ে যাবে পাঞ্জাবীদের। বিদ্যুৎপ্রবাহের মত সেই ভয় জাগিয়ে দিল মানুষকে—প্রথমে বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি অংশকে, পরে ছাত্রদের, এবং তারও পরে সমগ্র দেশবাসীকে। বড় ভয় এসে ছোট ভয়কে, নিরাপত্তার ভয়কে, ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করতে না পারার ভয়কে জয় করে নিল। ভীত-সন্ত্রস্ত বাঙ্গালী দেখলো তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তখন মরিয়া হয়ে ওঠা ভিন্ন অন্য কোন পথ রইল না। যে শাসকেরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল সেই শাসকেরাই আজ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলাদেশের সকল মানুষের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন সেই জ্ঞানটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে এনে দিল। শাসকদের স্ববিরোধিতার পুরাতন নাটক এইখানেও নতুন করে অভিনীত হল, স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েই তারা স্বার্থ বিনষ্ট করল।

বলাই বাহুল্য যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধু রাষ্ট্রভাষার জন্য আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না। থাকলে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হত না। এই আন্দোলন অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত এর গতিধারা প্রসারিত। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা এ দেশের পুরাতন ব্যাধি, ইংরেজ আমলে এই ব্যাধির প্রকোপে আমরা অনেক দুর্ভোগ ভোগ করেছি। পাশাপাশি থেকেও দুই সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, নিজেদের স্বার্থকে এক করে দেখতে পায় নি। ইংরেজ যুগে সৃষ্ট অতিশয় সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবন ও লেখকদের উপস্থিতির সামান্যতাটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, মুসলমান মধ্যবিত্ত সত্যি সত্যি পিছিয়ে পড়েছিল এবং হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে পিছিয়ে-পড়া মুসলমানদের এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি যাতে করে সাহিত্যে মুসলিম জীবন অনায়াসে বিচিত্র হতে পারে। ১৯০৫-এর বঙ্গ ভঙ্গ রদ করা সম্ভব হয়েছিল বটে, কিন্তু ১৯৪৭-এর বঙ্গ ভঙ্গ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বিভাগ মুসলমান মধ্যবিত্ত তো চেয়েছিল বটেই, শেষ পর্যন্ত হিন্দু মধ্যবিত্তের পক্ষেও না চেয়ে উপায় থাকে নি, ১৯০৫-এ যাঁরা বঙ্গ ভঙ্গের বিরোধী ছিলেন ১৯৪৭-এ তাঁরা আর বিরোধী থাকতে পারেন নি। এই রকমের একটা সাম্প্রদায়িক পরিবেশে, সাম্প্রদায়িকতার ফলে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রে এত তাড়াতাড়ি যে একটি অসাম্প্রদায়িক গণআন্দোলন গড়ে উঠতে পারল এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে পাকিস্তানের ব্যর্থতা ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং সেই ব্যর্থতা দেখে বাংলাদেশের মানুষ ভয় পেয়েছিল।

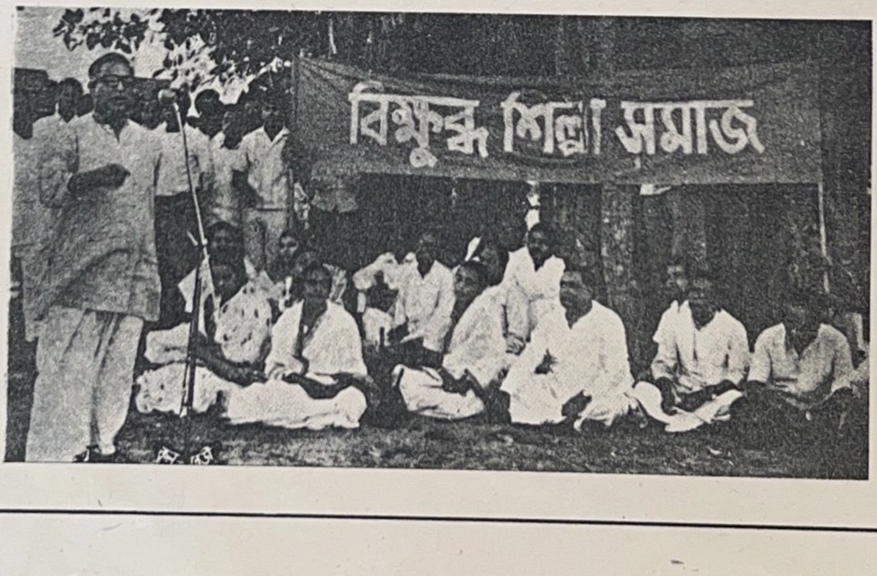

শুধু অসাম্প্রদায়িক নয়, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও বটে। সমাজতন্ত্রের কথা আন্দোলনের কালে স্পষ্ট করে বলা হয় নি বটে, কিন্তু সন্দেহ নেই এ আন্দোলন ছিল সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার আন্দোলন। বাংলাদেশের সন্ত্রস্ত মুসলমানেরা একদিন পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, এর সাহায্যে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করবে বলে। সেই অস্ত্র যখন বরং উল্টো কাজ করবে বলে ভয় হল, তখন তারা একে পরিত্যাগ করে অন্য একটা অস্ত্রকে শাণিত করে তুলতে চাইল, বাংগালী জাতীয়তাবাদের অস্ত্র। স্বাধীনতা অন্দোলনে সেই অস্ত্রই মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করেছে, যুদ্ধাস্ত্রের সংগে।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একটি সম্পূর্ণ নতুন ও অতিশয় প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সরবরাহ করেছে তরুণ ছাত্রদের জীবনে। সে অভিজ্ঞতা আত্মত্যাগের ও নির্য্যাতনভোগের। বাংলাদেশের মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট দুর্ভোগ সহ্য করে নি, পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত দেয় নি বলে তরুন সমাজের মনে একটা লজ্জা ছিল। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারীতে যখন রক্ত বইল, যখন কারাভোগ এল, এল পুলিশের পিছু-নেওয়া, তখন লজ্জা ঘুচল কিছুটা, দ্বিধা কাটল অনেক পরিমাণে, দৃঢ়চিত্ততা এল সংগে সংগে।

এ দেশের লেখক, সাংবাদিক, গায়ক, চিত্রকর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্যে শিল্পের যে পরিমাণ উপাদান যত সহজে পেয়েছেন তেমন অন্য কোথাও পান নি। একুশে ফেব্রুয়ারী কোনদিন ম্লান হয় নি, ১৯৫২ সালের পর প্রতিটি বছর উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। বাইরে, রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারীর আবেদন কর্মেনি, ক্রমশঃ বেড়েছে। তার কারণ এই আন্দোলন শক্তি পেয়েছে পাকিস্তানের ব্যর্থতা থেকে, যে ব্যর্থতার বোঝা দিনকে দিন বাড়ছিল; শক্তি পেয়েছে জনসাধারণের অসন্তোষ থেকে, যে অসন্তোষও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের পুঞ্জিভূত রূপ হচ্ছে এই আন্দোলন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের দাবীদার মুসলিম লীগকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে দিয়ে সাধারণ মানুষ জানিয়ে দিল যে মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তানের হাতে তাদের স্বার্থ যে নিরাপদ নয় এ সত্য তাদের কাছে আর অস্পষ্ট নয়। পরে এই সত্য আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, যত প্রত্যক্ষ হয়েছে তত বেড়েছে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ সব সময়ে প্রকাশের পথ পায় নি, যখন পায় নি তখন তা আরো বেশী দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারী শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান যোগাতে পেরেছে আরো এই কারণে যে এই আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভংগিতে একটা অত্যন্ত বড় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিম মধ্যবিত্তের দৃষ্টি অনেক সময়ে ছিল পশ্চিমমুখো, তাদের মনে অভিমান ছিল, তাদের মাতৃভাষা বাংলা কিনা এ নিয়েও এক সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল। একুশে ফেব্রুয়ারী বুদ্ধিজীবীদেরকে দেশের সংগে একাত্ম করে দিল। তাঁরা ঘরে ফিরে এলেন গভীর

ভালোবাসা নিয়ে। তাঁরা দেশের মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এতদিন ধর্ম ছিল ঐক্যের বন্ধন, এখন সেখানে এল ভাষা। একুশে ফেব্রুয়ারীর পর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী যখন দেশের কথা বলেছেন তখন অধিকাংশ সময় তাঁরা আসলে বাংলাদেশের কথাই বলেছেন, পাকিস্তানের কথা নয়। দেশপ্রেম তাঁদের দেশদ্রোহী করেছে—এক অর্থে। বায়ান্নর পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মমতার ক্ষেত্রে, চর্চার ক্ষেত্রে বান ডেকে জোয়ার এসেছে। রচনার উৎকর্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক পরিমাণে। এর ফলে শুধু যে ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে তা নয়, মানুষের মধ্যে ঐক্যের বোধ বেড়েছে, বেড়েছে সচেতনতা, বেড়েছে সুন্দরতর জীবনের প্রতি আকর্ষণ। বাইরে যাই বলুক পাকিস্তানের শাসকরা একুশে ফেব্রুয়ারীকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছিল, তাই গণহত্যা শুরু করেই তারা ছুটে গিয়েছিল শহীদ মিনারের দিকে, মিনারকে ভেঙে দিয়ে আক্রোশ মিটিয়েছিল তারা। আর মিনারের জায়গায় মসজিদ তৈরী করে তারা তাদের পুরাতন কৌশল নতুন করে প্রকাশ করেছিলঃ কৌশলটা হল ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে বিক্ষোভকে স্তিমিত করা।

বাংলা ভাষার ব্যাপারে পশ্চিমা শাসকবর্গ একগুঁয়েমির পরিচয় দিয়েছে প্রথমটায়। হয়ত তার পেছনে ভয় ছিল, স্বার্থ নষ্ট হবার ভয়, কিন্তু পরে যখন তারা দেখেছে যে এ-আন্দোলন কিছুতেই স্তব্ধ হবার নয় তখন ১৯৫৬ সালের এবং পরে ১৯৬২ সালের সংবিধানে বাংলাকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু ততদিনে বাংলাদেশের মানুষ আরো অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে, পাকিস্তানে যে তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই এটা তাদের জানা হয়ে গেছে, এবং জানা হয়ে গেছে বলে ততদিনে তারা শুধু ভাষার অধিকার নয়, পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করেছে।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সচেতনতা ও বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ যত বৃদ্ধি পেয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে তত বেশী চেষ্টা হয়েছে তাদেরকে প্রলুব্ধ করবার। বুদ্ধিজীবীদের পেছনে আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে, পুরস্কার পারিতোষিকের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। বাইরে থেকে মনে হয়েছে প্রলোভনের জালে অনেকেই ধরা দিচ্ছেন। ধরা দিয়েছেন কেউ কেউ, কিন্তু এমন কি যাঁরা দিয়েছেনও তাঁরাও দেখা গেছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারছেন না। তার কারণ পাকিস্তানের কৃত্রিমতাটা তাঁদের কাছে ততদিনে ধরা পড়ে গেছে। পাকিস্তানের শাসকরা চিরকালই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে ছিল, সেই দূরত্ব যে ক্রমশঃ বাড়ছে বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সেটাও লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না। সরকার টাকা দিল, কিন্তু মন পেল না। তমঘা দিল, সেই তমঘা পরে কেউ কেউ পরিত্যাগ করলেন, করে বিব্রত করলেন সরকারকে। সরকার সাহিত্যের জন্য পুরস্কার দিল, কিন্তু সেই পুরস্কার সরকার বিরোধীরা পাওয়া শুরু করলেন। এমন কি পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার উপর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপকারী রচনাও পুরস্কার নিয়ে গেল। সরকার টাকা দিল লেখক সংঘ গড়বার জন্য, কিন্তু বাংলাদেশে দেখা গেল লেখক সংঘ সরকারী নীতির সমর্থন তো করছেই না, পরন্তু প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছে।

সরকার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও পশ্চিম পাকিস্তানের ইতিহাস যে অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত তা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু ইতিহাস তো সরকারের কেনা গোলাম নয়, ইতিহাস ঐ কৃত্রিম ছকে আবদ্ধ হতে রাজী হয় নি। অতীতের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা সফল হয় নি, বাংলাদেশের মানুষ তাতে আস্থা রাখে নি; এবং চলমান ইতিহাসের ধারা তো চোখের সামনেই দেখা গেছে দুই ভিন্ন দিকে চলেছে। চেষ্টা হয়েছে এটা প্রমাণ করার যে বাংলা ও উর্দু ভাষার মধ্যে সাধারণ ঐতিহ্য আছে, আছে নিকটবর্তিতা। কিন্তু এসব কথাতেও বাংলাদেশের মানুষ সাড়া দেয় নি উর্দু যে বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় এ কথা তারা কিছুতেই ভুলতে পারে নি। বাংলাভাষাকে শিক্ষা ও সরকারী কাজের ভাষা হিসাবে প্রয়োগ করার দাবী বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তুলেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও দাবী উঠেছে উর্দুর পক্ষে। মাতৃভাষাকে জীবনের সর্বত্র প্রচলিত করার পক্ষে দুই পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা অনেক সময় এক সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন এই দাবী গভীর দেশপ্রেম থেকে উৎসারিত। তা উৎসারিত ঠিকই, কিন্তু সে দেশ এক দেশ নয়, দুই দেশ। উর্দু প্রচলনের দাবী বাংলার আন্দোলনকে সাহায্য করেছে। সরকার চেষ্টা করেছে ধর্মের কথা বলতে, পাকিস্তান না থাকলে ইসলাম থাকবে না,

ইসলাম না থাকলে বেঁচে থেকে কি লাভ—এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করতে, কিন্তু এই ধর্মীয় প্রতারণাতেও কোন সুফল হয় নি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, একটা বড় ভূমিকা ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই একদিন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে এখানেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে নানাভাবে বাঁধবার চেষ্টা করা হয়েছে। কালা-কানুন চালু করে এর যে স্বাধীনতাটুকু এমন কি ইংরেজ আমলে চালু ছিল সেটাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপকদের লেখা ও মতামত প্রকাশের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে আবার চেষ্টা করা হয়েছে তাদেরকে প্রলুব্ধ করবার। শুধু দেশী সরকার নয়, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহও বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টির জন্য, সেই শ্রেণী এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরও গড়ে উঠেছিল। দুর্বলচিত্ত ও লোভী মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু তবু, বিচ্যুতি সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভূমিকা ছিল জনসাধারণের, অর্থাৎ বাংলাদেশের পক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পাকিস্তানবাদী ছিলেন তাঁরা চুপ করে ছিলেন না, তাঁদের পেছনে সরকারের সমর্থন ও সহায়তা ছিল, কিন্তু তবু তাঁদের কাজ দেশের উপর বড় কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে নি, বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করেছে। ইংরেজরা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করত, পাকিস্তানীরা আরো বেশী করত—সংগত কারণেই। অবিশ্বাস করত বলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে তাদের কোন উৎসাহ ছিল না। চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করা হল শহর থেকে অনেক দূরে, পাহাড়ের মধ্যে। সাভারের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করার পরিকল্পনা করল, নাম দিল মুসলিম' বিশ্ববিদ্যালয়, জায়গা করল ঢাকা শহর থেকে দূরে লোকবসতিহীন এক প্রান্তরে। এক সময়ে চেষ্টা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। উদ্দেশ্যটার মধ্যে কোন লুকোচুরি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না পরিপূর্ণভাবে, তাকে রাখতে হবে জনজীবন থেকে দূরে; কেননা বিশ্ববিদ্যালয় যদি বড় হয়, অনেক হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি শহরের মাঝখানে থাকে তবে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা 'রাজনীতি' করবে, অর্থাৎ অধিকারের কথা বলবে, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সভা-শোভাযাত্রা-বিক্ষোভ শুরু করে দেবে। অবিশ্বাস শুধু নয় ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড একটা ক্রোধ ছিল শাসকদের। যার প্রমাণ পাওয়া গেল তখন যখন গণহত্যার সূচনাতেই মিলিটারী ছুটে এল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এসে ছাত্র-শিক্ষক যাকে পেল হাতের কাছে গুলি করে হত্যা করল, দালান-কোঠাও রক্ষা পেল না। আত্মসমর্পণের আগে আবার তারা অনুচরদের পাঠিয়েছে বেছে বেছে বাংলাদেশের আন্দোলন সমর্থনকারী শিক্ষকদের হত্যা করার জন্য।

শুধু শিক্ষক বলে নয়, গোটা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিই আক্রোশ ছিল। হানাদারদের পরিকল্পনা ছিল প্রত্যেক শহরে তারা ঠান্ডা মাথায় বুদ্ধিজীবী নিধন করে যাবে আত্মসমর্পণের আগে। এবং কাজ তারা শুরুও করেছিল, শেষ করে যেতে পারে নি এটাই যা রক্ষা। এর কারণ বুদ্ধিজীবীদের উস্কানিতেই বাংলাদেশ স্বাধীন হতে চেয়েছে বলে তাদের ধারণা। বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী বলে কেউ না থাকুক, থাকুক শুধু সাধারণ মানুষ এটাই তাদের কল্পনার স্বর্গ ছিল, কেননা তাহলে তাদের ধারণা তারা অনাদিকাল ধরে এই দেশে শোষণকার্য অব্যাহত রাখতে পারত। সন্দেহ নেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বুদ্ধিজীবী সমাজের অধিকাংশ মানুষ সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন, অনেক সময়ে ছিলেন অগ্রবর্তীও।

বাংলার অর্থনীতিবিদদের একটি অংশ সাধারণ মানুষের সচেতনতাকে অনেকটা অগ্রসর করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ যে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে এটা সকলেরই জানা ছিল। অর্থনীতিবিদেরা সেই সত্যটা আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে ১৯৫৪-র সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে তাঁরা দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতি পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রে ক্রমশঃ পংগু হয়ে পড়ছে। সরকার তথ্য বিকৃত করত, অনেক তথ্য বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদদের হাতে আসত না, কেন্দ্রীয় অর্থ দফতরের উচ্চপদে বাঙ্গালীদের নিয়োগ করা হত না, তবুও অর্থনীতিবিদেরা এটা বুঝেছিলেন যে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে দুটিই স্বতন্ত্র অর্থনীতি চালু করা প্রয়োজন। শেষ দিকে দুই অঞ্চলের অর্থনীতিকদের মধ্যে মতবিরোধ এত প্রবল হত যে তাঁরা কোন কোন ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করতেন। আইয়ুব খান চতুর লোক ছিলেন, দুই অর্থনীতির দাবী তাঁর সময়েই জোরেশোরে উঠেছিল, এবং তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে দুই অর্থনীতির পরিণাম দুই পাকিস্তান। আইয়ুব খান এই দাবী স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন ধমক দিয়ে, অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করার হুমকি দিয়ে। কিন্তু তাতে সত্য অসত্য হয়ে যায় নি, ফাটল জোড়া লাগে নি। ফাটল শুরু হয়েছিল ভাষাকে কেন্দ্র করে, অর্থনীতি সেই ফাটলকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিয়েছে, পরিণতিতে শুধু দুই অর্থনীতি বা দুই পাকিস্তান নয়, দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাষার ফাটলের কথাও আইয়ুব খান জানতেন। পতনের আগে তিনি একবার দুই অঞ্চলের জন্য একটি সাধারণ ভাষা সৃষ্টি করার কথা বলেছিলেন। সন্দেহ নেই সে কাজ করতে গেলে ফাটল তো বন্ধ হতই না, বরং আরো বৃদ্ধি পেত।

প্রত্যক্ষ ভূমিকার বাইরে বুদ্ধিজীবীদের অপ্রত্যক্ষ ভূমিকাটাও কম গুরুত্বের নয়। বাংলা দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম তাই শিক্ষিতের মর্যাদা বেশী। সম্মান প্রদর্শনের অভ্যাসও এদেশে পুরাতন। বুদ্ধিজীবীদের তাই এদেশে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান আছে। সেইজন্যই দেখা যায় বুদ্ধিজীবীদের উপর যখন আক্রমণ এসেছে তখন আহত হয়েছে সমগ্র দেশ, বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে দেশের সাধারণ মানুষ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরুতে ছিল মূলতঃ ছাত্রদের আন্দোলন, কিন্তু যে-মুহূর্তে গুলি চলল ছাত্রদের উপর, গ্রেফতারী পরোয়ানা নেমে এল শিক্ষকদের উপর তখনি, অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে, ছাত্র আন্দোলন লেলিহান গণআন্দোলনে পর্যবসিত হল। তেমনিভাবে উনসত্তরের আন্দোলন তার চরমরূপ পরিগ্রহ করল সেই মুহূর্ত থেকে যেই মুহূর্তে খবর প্রচার হল যে, মিলিটারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জোহাকে গুলি করে হত্যা করেছে। ঢাকায় তখন কার্ফ্যু ছিল, কিন্তু ঐ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হাজার হাজার মানুষ বার হয়ে এসেছিল রাস্তায়। কেউ তাদের বলে নি বার হয়ে আসতে, ডঃ জোহাকে তারা জানে না, বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাকুক, কোন বিদ্যালয়েই যায় নি তাদের অধিকাংশ মানুষ, কিন্তু তবু ডঃ জোহার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে তারা তাদের নিজেদের অপমানকে দেখল, দেখল তাদের নিজেদের অস্তিত্বের উপর নৃশংস এক আক্রমণকে। ফলে আন্দোলন এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, তার স্রোতে আইয়ুব খান-মোনেম খান ভেসে চলে গেল কোথায়।

উনসত্তরের আন্দোলনের সময় যারা প্রেস ট্রাস্টের সংবাদপত্র দু'টির অফিস পুড়িয়েছে তাদের অনেকেই হয়ত সংবাদপত্র পড়ে না, কিন্তু তারা জানত সংবাদপত্র দু'টি তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছিল। অন্যদিকে সরকার যখন যে-পত্রিকার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে তখন সেই পত্রিকাকে জনসাধারণ আদর করে বুকে তুলে নিয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিল সেই সময়ে যখন তার প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল, যখন তার সম্পাদক কারারুদ্ধ ছিলেন। পুস্তক নিষিদ্ধ করার কাজে সরকারের উৎসাহ ছিল, কিন্তু শেষের দিকে সরকার আর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করতে সাহস পায় নি, প্রচার করলেও সে নিষেধাজ্ঞা মান্য করা হয় নি।

১৯৭১ এর গণহত্যা যখন শুরু হয় তখন বাংলাদেশের মানুষের মনে সবচেয়ে বেশী মর্মান্তিকভাবে বেজেছে যে-ঘটনা সে হল বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকান্ড। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে ছিল এই ঘটনার পর নিশ্চিত জেনেছে যে পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোন পথে বাঙ্গালীর বাঁচার উপায় নেই।

বুদ্ধিজীবীদের যে-অংশ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারের তাঁবেদার হিসাবে কাজ করেছে তাদের প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে। আটষট্টি সালে 'অগ্রগতির দশ বছরে'র গুণকীর্তন করে যখন প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে একটি করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছিল, যখন প্রতিদিন মস্ত মস্ত ছবি ছাপা হচ্ছিল আইয়ুব খানের তখন সেই সমারোহ যেমন করে বিদ্বিষ্ট করে তুলছিল পাঠকদের (যার খবর প্রচারকরা রাখত না), তেমনিভাবে প্রলুব্ধ ও স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার বর্ধিষ্ণু সমারোহও ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল মানুষের মনে। বিশেষ করে আইয়ুব রাজত্বকালে, কেননা সেই কালেই উদ্যোগ-আয়োজনটা বেড়েছিল সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশ মীরজাফরদের জন্ম যেমন দিয়েছে তেমনি তাদের ঘৃণা করতেও কার্পণ্য করে নি।

তারচেয়েও বড় কথা এই সুবিধাভোগী ও ক্ষেত্রবিশেষে নির্বোধ, বুদ্ধিজীবীদের লেখায়-বক্তৃতায় ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। তাঁরা যা ভালো বলেছেন জনসাধারণ নিশ্চিত জেনেছে যে, তা মন্দ না হয়ে যায় না। তাঁরা যার পক্ষে থেকেছেন জনসাধারণ তার বিপক্ষে গেছে। অবশ্য এ'রা পক্ষে যত না বলেছেন বিপক্ষে বলেছেন তার চেয়ে বেশী, কেননা এ'দের প্রধান চরিত্র হচ্ছে বর্জনবাদীর। এ'রা বলেছেন ইকবাল অতি মহৎ কবি, বাংলাদেশের মানুষ সেই মহত্ত্ব দেখতে পায় নি। এ'রা বলেছেন রবীন্দ্রনাথকে বর্জন কর, যত বলেছেন এই কথা, তত জনপ্রিয়তা বেড়েছে রবীন্দ্রনাথের, তত বেশী দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশের মানুষ আঁকড়ে ধরেছে রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ কবি থাকেন নি, তিনি জাতীয় বীরে পরিণত হয়েছেন, তাঁর গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এ'রা বলেছেন বাংলা ভাষাকে ইসলামী কর, যত বলেছেন, তত বেড়েছে সমগ্র বাংলা ভাষার প্রতি মানুষের প্রীতি ও আকর্ষণ। হরফ বদলানোর পরামর্শ এ'রা দিয়েছেন, সেই পরামর্শ সকলে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ'রা বলেছেন নজরুল ইসলামের সংস্কার আবশ্যক, সাধারণ মানুষ বলেছে নজরুল ইসলাম আমাদের একান্ত আপনার জন। এ'রা বলেছে পুঁথি সাহিত্যই আসল সাহিত্য, সাধারণ পাঠক বুঝে নিয়েছে পুঁথি সাহিত্যের পক্ষে ঐ প্রচারে ফাঁকি আছে। মোটকথা, এ'দের কাজ সম্পূর্ণ বিপরীত ফল উৎপাদন করেছে। তার কারণ এই যে, সাধারণ মানুষ জানত এ'রা তাদের স্বার্থের শত্রু, এ'রা তাদের বন্ধু নন, এ'দের উদ্দেশ্য পশ্চিমাদের শোষণব্যবস্থাটাকে কায়েমী করে রাখা।

এইভাবে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন যে-সকল বুদ্ধিজীবী তাঁরাও নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, পরোক্ষে জনতার উপকারই করেছেন। জনতার দৃষ্টি খুলে দিতে তাঁরাও সাহায্য করেছেন, এই করে জনতার আন্দোলনকে তাঁরাও এগিয়ে দিয়েছেন।

বুদ্ধিজীবী সমাজের যে-অংশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিলেন তাঁরা বিবেকবান ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁরাও

আসলে নিজেদের স্বার্থেই কাজ করেছেন, তবে তফাৎ এই যে, তাঁদের স্বার্থকে তাঁরা জনসাধারণের স্বার্থ থেকে ভিন্ন করে দেখেন নি। এবং উভয়ের স্বার্থ যেহেতু ছিল এক ও অভিন্ন, তাই তাঁদের কাজের ফলে জনসাধারণের আন্দোলনের উপকার হয়েছে।

পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে কোন দার্শনিক প্রস্তুতি ছিল না, যদিও পরবর্তীকালে প্রচার করা হয়েছিল যে, বিশিষ্ট জীবানদর্শনের প্রয়োজনেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের আন্দোলনও কোন গ্রন্থপাঠ থেকে শুরু হয় নি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে ছিলেন, এই আন্দোলনে তাঁরা সরাসরি নেতৃত্ব দেন নি, আন্দোলন যখন এগিয়ে গেছে তখন তার গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতেও হয়ত তাঁরা পারেন নি, পিছিয়ে পড়েছেন, তবু তাঁরা সঙ্গেই ছিলেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সভা করে গুলিবর্ষণের নিন্দা করেছেন, ফলে তাঁদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। উনসত্তরের এবং একাত্তরের আন্দোলনের সময় শিক্ষকরা রাজপথে শোভাযাত্রা করেছেন।

এসব ঘটনা ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু এগুলোর তাৎপর্য আছে। তাৎপর্য এই যে, বোঝা গেছে বিক্ষোভ সার্বজনীন হয়ে উঠেছে, তারচেয়ে বড় কথা বোঝা গেছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষ এক হয়ে গেছে। সেই একতার দরুনই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

জনতার সঙ্গে-চলা বুদ্ধিজীবী সমাজ জনতার অগ্রবর্তী অংশ হিসাবেই কাজ করেছে। পাকিস্তানের ব্যর্থতার লক্ষণ প্রথমে ধরা পড়েছে তাঁদের কাছেই, পরে তাঁরাই প্রমাণ পেয়েছেন সেই ব্যর্থতার। তাঁরাই বুঝেছেন ভাষার উপর আক্রমণের অর্থ কি, অর্থনীতির গতি কোন দিকে। সেই জ্ঞানকে তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বাকি কাজটা সাধারণ মানুষ নিজেরাই করেছে। বাংলাদেশকে তারা স্বাধীন করে নিয়েছে–নিজের হাতে।

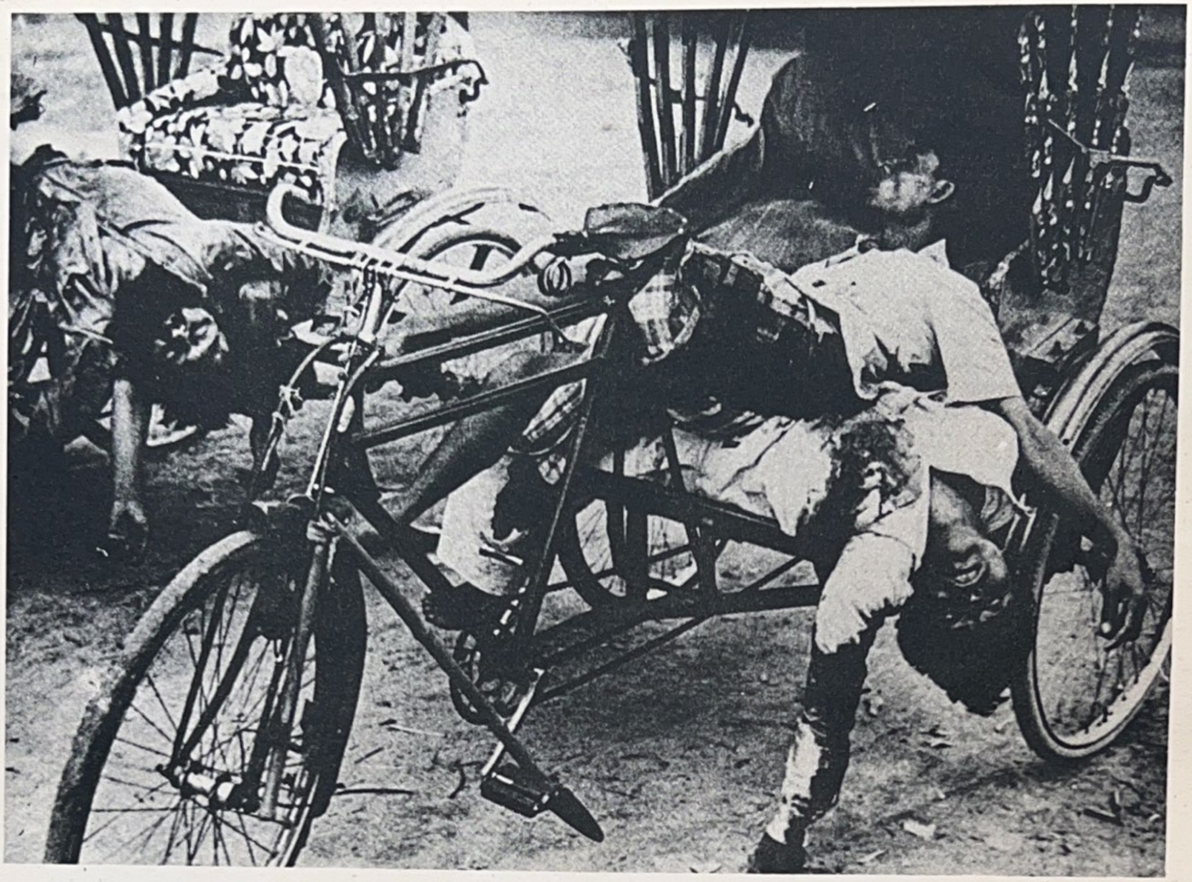

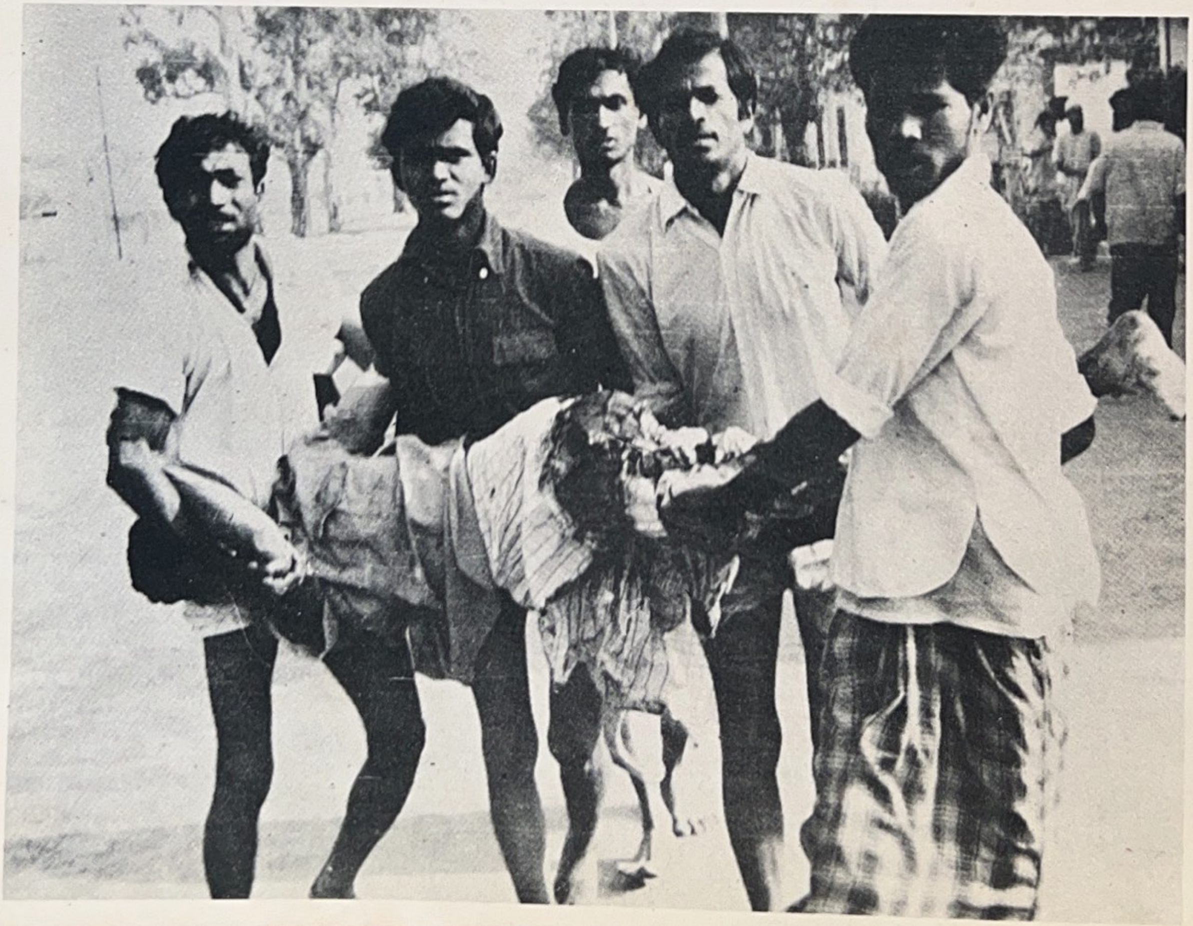

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবী দলন

নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অনেক দিক দিয়েই অনন্য। এতো অল্প সময়ে এতো রক্ত এতো প্রাণ আর কোন জাতি দেয় নি। এতো সম্পদহানি এবং ধ্বংসলীলা আর কোন দেশে হয় নি। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ, বিশেষতঃ মা-বোনের উপর এতো অত্যাচারের নজীরও কোথাও নেই। তবু ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হলে এদেশের চিরনিপীড়িত ও নিষ্পেষিত মানুষ মহাবিজয়ের আনন্দে কিছু সময়ের জন্যে তাদের সমস্ত ত্যাগ ও ব্যথা-বেদনার কথা ভুলে যায়। ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তারা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্নে উদ্বেলিত হয়।

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে একটি দুঃসংবাদ আকস্মিকভাবে প্রত্যেকের হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিঁধে। সংবাদটি হচ্ছে চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্তে বাংলাদেশের মস্তিষ্ক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অনেকেই হানাদার বাহিনী ও তাদের তাঁবেদার আলবদরের নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হয়েছে।

ঐতিহাসিক ২৫শে মার্চের পর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের উপর যে সুপরিকল্পিত হত্যালীলা চালানো হয়, তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই বাঙ্গালী সংস্কৃতি, বুদ্ধিসত্তা ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে একটি ঔপনিবেশিক শক্তি যে ষড়যন্ত্র শুরু করে এটি তারই চূড়ান্ত পরিণতি। এই চক্রান্ত বাঙ্গালীর ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে জাল বিস্তার করে। কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে এবং কোথাও সাম্প্রদায়িকতাবাদী কিংবা অনুগ্রহপুষ্ট দালাল শ্রেণীর মাধ্যমে তারা বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তাকে পঙ্গু ও নির্মূল করার অভিযান অব্যাহত রাখে।

মনীষী গোর্কী বলেছেন, মাছের যেমন পচন শুরু হয় মাথা থেকে, তেমনি কোন জাতিরও অধপতনের সূত্রপাত হয় মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তি একটি জাতির সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তাকে উৎখাত করে নিজেদের শোষণ ও শাসন চিরস্থায়ী করার জন্যে এই মনীষী বাক্যকেই ঘৃণ্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তারা একদিকে বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্যে এবং

অন্যদিকে এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিক প্রভৃতি শ্রেণীকে পঙ্গু ও নির্জীব করার জন্যে বহু ধরনের চক্রান্তে মেতে উঠেন এঁদের উপর কোথাও জেল-জুলুম এবং হয়রানি চালানো হয়। কখনও চাপ এবং ভীতি প্রদর্শন করে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা চলে। অর্থ পদোন্নতি, খেতাব ও ইনামের মোহ সৃষ্টি করা হয়।

সাতচল্লিশের আগস্টে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তা উৎখাতের অভিযান। ডিসেম্বরের শুরুতে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা-সম্মেলনে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়। আটচল্লিশের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পূর্ব বাংলার অন্যতম সদস্য ধীরেন দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবী জানালে তীব্র কটাক্ষ সহকারে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। ২১শে ও ২৪শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ সব উক্তি ও সুপারিশের পাশাপাশি বাংলাকে নির্বাসন দিয়ে বিভিন্ন সরকারী পর্যায়ে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকে।

বাংলা ভাষাকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বর্ণমালা উৎখাতেরও চক্রান্ত শুরু হয়। আটচল্লিশ সালের ডিসেম্বরে নিখিল পাক শিক্ষক সম্মেলনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবী (কার্যত উর্দু) হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করেন। উনপঞ্চাশ সালের ফেব্রুয়ারীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় আরবীকে একমাত্র বর্ণমালা হিসেবে গ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। পঞ্চাশের এপ্রিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরবী হরফে বাংলা শেখানোর জন্যে ২০টি কেন্দ্র চালু করা হয়।

বাংলাভাষা ও বর্ণমালাকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে বায়ান্ন সালের প্রথমভাগে। ঔপনিবেশিক শাসকদের এসব উদ্যোগ ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, বিশেষত ছাত্র সমাজ শুরু থেকেই রুখে দাঁড়ায়। প্রতিটি অশুভ পদক্ষেপের বিরুদ্ধেই বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রতিবাদ জানায় এবং ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধর্মঘট করে। ফলে সরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠে। এ ব্যাপারে তারা উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং তথাকথিত ইসলামী ও পাকিস্তানী আদর্শকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সরল ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তা ছাড়া অর্থ ও পদের প্রলোভন এবং নানা প্রকার পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাংলাদেশের তৎকালীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং ছাত্র সমাজ বাংলাভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার প্রশ্নে মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ ছিলো। তাই ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীন যখন আবার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করেন এবং তার ফলে সরকারী চক্রান্ত ফাঁস হয়ে পড়ে, তখন সর্বত্র বিক্ষোভবহ্নি জ্বলে উঠে। ঢাকার ছাত্র সমাজ সর্বশক্তিতে এই অশুভ উদ্যোগকে রুখে দাঁড়ায়। এরই পরিণতিতে ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারী সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রশ্নে বাঙ্গালীর রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারীর আঘাত বাঙ্গালীর সমগ্র চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষও সচেতন এবং সক্রিয় হয়ে উঠে। তাই শাসক গোষ্ঠী বাংলাভাষার বিরুদ্ধে তাদের প্রকাশ্য তৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। একুশের চেতনারই ফলশ্রুতি হিসেবে '৫৪ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশে মুসলিম লীগের শোচনীয় বিপর্যয় ঘটে। বাঙ্গালীর সার্বজনীন দাবী হিসেবে শেষ পর্যন্ত বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবেও স্বীকৃতি পায়। কিন্তু সরকারীভাবে স্বীকৃতি পেলেও কার্যক্ষেত্রে নানা প্রকার শঠতা ও চক্রান্তের মাধ্যমে বাংলাভাষাকে উপেক্ষা ও কোণঠাসা করা হয়। তা ছাড়া এবারে শুরু হয় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার কূট চক্রান্ত।

প্রথমেই শুরু হয় বাঙ্গালীর নাম ভুলানোর চেষ্টা। এতোদিন সরকারী কাগজপত্রে এবং জনসাধারণের মুখে মুখে বাংলাদেশ পূর্ব বাংলা নামে অভিহিত হলেও তথাকথিত পাকিস্তানী আদর্শ এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির দোহাই দিয়ে পূর্ব বাংলাকে সরকারীভাবে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। যারা এর পরেও বেসরকারীভাবে পূর্ব বাংলা নাম ব্যবহার করতেন তাঁদের উপর নানা প্রকার চাপ প্রয়োগ করা হয়। দেশের নাম ছাড়াও প্রায় সর্বত্রই বাংলা নামের যায়গায় পাকিস্তানী বা তথাকথিত মুসলমানী নাম প্রবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। স্থানের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, দোকান-পাট ও সিনেমা হলের নাম, সম্বোধন, সাধারণ কথাবার্তা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পাকিস্তানী তথা উর্দু প্রচলনের হিড়িক পড়ে যায়। মন্ত্রীরা উজীর হয়ে যান, প্রেসিডেন্ট সদরে রূপান্তরিত হন। এক কথায় পাকিস্তানীদের ভাষায় তারা 'হিন্দু বাংলাকে 'মুসলমানী বাংলায়' রূপান্তরে উঠেপড়ে

লাগে।

কিন্তু তাদের এই 'ইসলামীকরণের' প্রচেষ্টা শুধু হাস্যকরই নয়, স্ববিরোধীও ছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুল-কলেজে রমজানের ছুটি ছিল না, অথচ 'পূর্ব পাকিস্তানে' তা চালু করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারে, 'পূর্ব পাকিস্তানে' শুক্রবারে। পশ্চিম পাকিস্তানে মহেঞ্জোদারো ও তক্ষশীলার সভ্যতা পাকিস্তানী, পূর্ব পাকিস্তানে' হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতা বিজাতীয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়, নজরুল পাকিস্তানী। আরবী ফারসী শব্দ থাকলে ইসলামী ভাষা, খাঁটি বাংলা শব্দ থাকলে বিজাতীয় ভাষা। পশ্চিম বাংলার বই আমদানি বন্ধ, অথচ পশ্চিমী অশ্লীল সাহিত্য আমদানিতে বাধা নেই। আসলে বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে বিকৃত ও পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে তারা জেনে শুনেই এ সব হাস্যকর ও স্ববিরোধী তৎপরতা চালায়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র চলে আরো সূক্ষ্ম-ভাবে। এখানেও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় তথাকথিত ইসলামী ও পাকিস্তানী আদর্শকে। বেতার, টেলিভিশন এবং সরকারী প্রচারমাধ্যমগুলোতে শুধু খাঁটি বাংলা শব্দ নয়, বাঙ্গালী চিন্তাধারাকেও নির্বাসন দেওয়া হয়। এগুলো প্রধানত বশংবদ এবং সুবিধাভোগী শ্রেণীর করায়ত্ত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং বিভিন্ন কালা-কানুনের মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশের পথ রুদ্ধ করা হয়। এর ফলে প্রবীণ সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চা সীমাবদ্ধ ও নির্জীব হয়ে পড়ে এবং নবীনরা বিভ্রান্তি ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিকৃতির

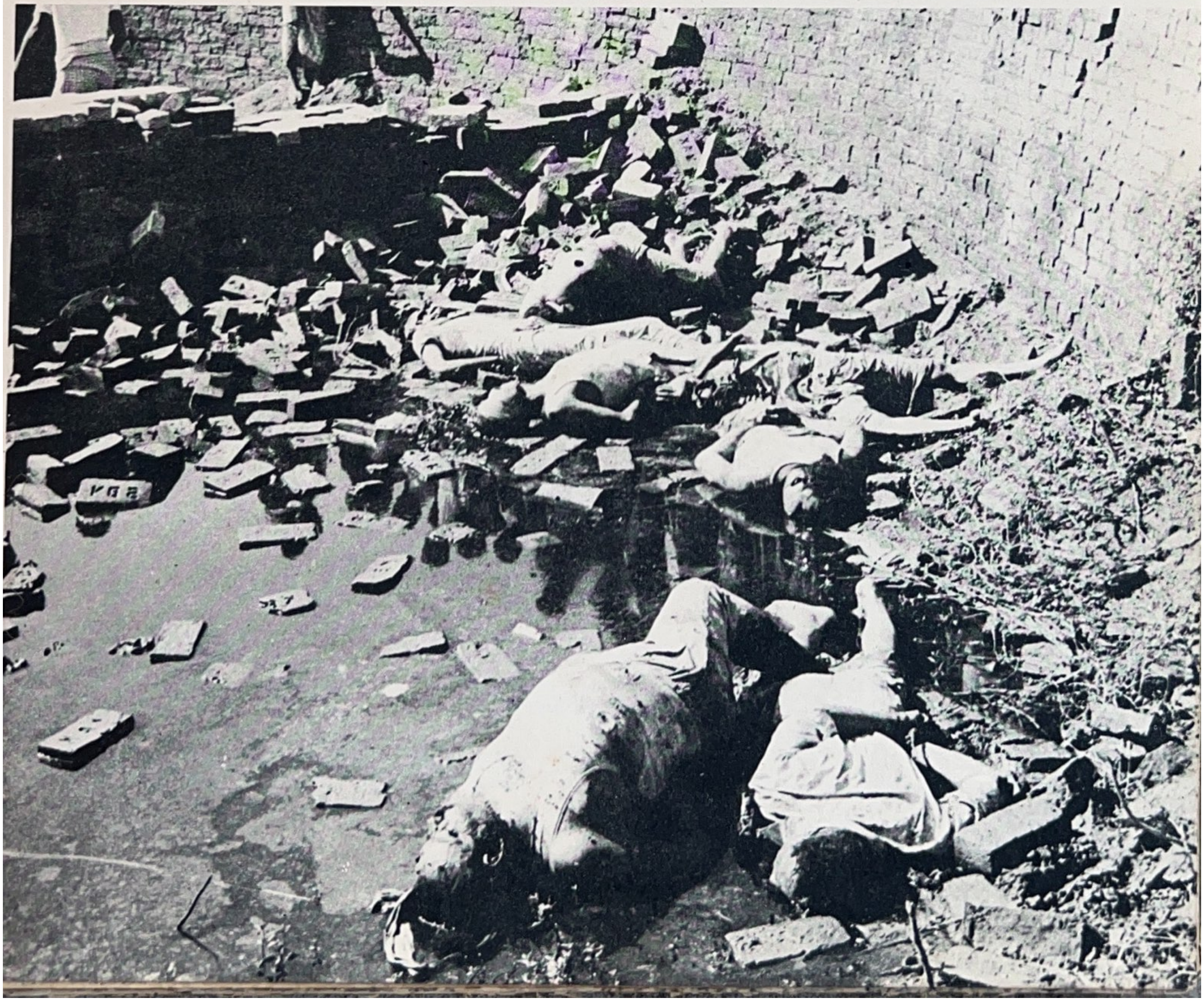

রায়ের বাজারের বধ্যভূমি

শিকার হন। নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথা-বেদনার পরিবর্তে বাইরের কৃত্রিম বিষয়বস্তু নিয়ে প্রাণহীন ও চিন্তাহীন সাহিত্যচর্চা চলে। অপর পক্ষে বশংবদ ও সুবিধাভোগী শ্রেণী আমাদের মূল সাহিত্যধারাকে বিকৃত ও পঙ্গু করার কাজে পুরোদমে এগিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। তাই তাঁকে সাহিত্য ও চিন্তাধারার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসন দিয়ে বাঙ্গালী সত্তাকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র পেকে উঠে। আইয়ুবের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন এবং তাঁর বাঙ্গালী বংশবদ গভর্ণর মোনেম এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন॥ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। সাহিত্যচর্চা ও চিন্তার স্বাধীনতাকে আরো আড়ষ্ট এবং পঙ্গু করার জন্যে পশ্চিম বাংলার বই-পুস্তক আমদানিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। যাঁরা এর প্রতিবাদ করেন তাঁদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয় সেই বশংবদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী শ্রেণীকে।

এ সময় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আরো পঙ্গু করার জন্যে এবং সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রলোভন ও পারিতোষিকের মাধ্যমে বিপথগামী করার জন্যে কতকগুলো নতুন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গঠন করা হয়। এগুলোর মধ্যে পাকিস্তান কাউন্সিল, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং পাকিস্তান লেখক সংঘের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান কাউন্সিল ও জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিলো পাকিস্তানী ও তথাকথিত ইসলামী আদর্শ প্রচার। কিন্তু এগুলোর প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিলো বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে নস্যাৎ করা। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তারা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 'মস্তিষ্ক শুদ্ধি' অভিযান চালায় এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করে তাদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার প্রয়াস পায়। বাংলা একাডেমী এদেশের ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার জন্যে অজস্র অর্থব্যয়ে পাল্টা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমী থেকে বাঙ্গালী সংস্কৃতিমনা পণ্ডিত ব্যক্তিদের তাড়িয়ে এবং সে স্থলে বশংবদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নিয়োগ করে প্রত্যক্ষভাবে এর উদ্দেশ্যকে বানচাল করার চেষ্টা চলে। একাডেমীর কর্মসূচীতেও পাকিস্তানী এবং তথাকথিত ইসলামী ভাবধারা ও বিষয়বস্তু প্রবর্তন করা হয়। বাংলা একাডেমী যখনই কোন গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে তখনই পাল্টা প্রতিষ্ঠানটি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তা নস্যাৎ করার জন্যে প্রচ্ছন্নভাবে তৎপর হয়। বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যখনই কোন প্রচেষ্টা চলেছে তখনই দেখা গেছে বিকল্প সংস্থার মাধ্যমে তার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা। ১৯৬৭ সালে বেসরকারী উদ্যোগে স্বাধীন চিন্তাধারা বিকাশের জন্যে ইতিহাস পরিষদ গঠিত হলে সঙ্গে সঙ্গে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাল্টা একটি সংস্থা গঠন করা হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তকে নস্যাৎ করার জন্যে এ ধরনের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বাঙ্গালীর বুদ্ধিচর্চা ও জ্ঞান সাধনাকে অঙ্কুরেই আড়ষ্ট ও বিনষ্ট করার জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এক গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলে। ইসলামী রাষ্ট্রের অজুহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়। স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকে ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু পাকিস্তানী করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলে। এর ফলে কেবল রবীন্দ্রনাথ কিংবা পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিকরাই বাদ পড়েন নি, এদেশের প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল লেখকরাও বর্জিত হন। পাঠ্যবইর ভাষায় তথাকথিত ইসলামী পোশাক পরানো হয়, ভাব ও চিন্তাধারায় এ দেশের মাটির সঙ্গে

সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় এবং বিষয়বস্তু প্রধানত আরব জগৎ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী করা হয়। বাঙগালীর নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ধূলোর লুণ্ঠিত হয়। এদিকে নানাভাবে শিক্ষা সঙ্কোচন পুরোদমে অব্যাহত থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে 'পূর্ব পাকিস্তানে' ১৯ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্র সাড়ে ৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিলো. সেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালে 'পূর্ব' পাকিস্তানে তা সাড়ে ১৭ হাজারে হ্রাস পায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৩ হাজারে বৃদ্ধি পায়।

প্রকাশকরা পাঠ্যবই ছাড়া প্রধানত ডিটেকটিভ ও বিকৃতরুচির বই প্রকাশে তৎপর হন। কারণ ইতিমধ্যেই এক শ্রেণীর পাঠকের. বিশেষত কোমল প্রকৃতির ছাত্র-ছাত্রীদের রুচিবিকৃতি ঘটানো হয়। তাই উন্নতমানের চিন্তাশীল লেখার তেমন কদর ছিলো না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরো বিকৃতি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তাদের মানসিকতা ও চিন্তাধারা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্বাধীন চিন্তাধারা সঙ্কোচন এবং 'ইসলামীকরণের' প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। কিন্তু সেখানে শিক্ষাবিদদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হামলাই সবচাইতে প্রকট হয়ে উঠে। ১৯৬৩ সালের হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন শিক্ষকদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণ করে। গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সত্যিকারের পণ্ডিত ও বাঙগালী সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের অপসারণ করে বশংবদদের নিয়োগ করার জন্যে নানাপ্রকার কারসাজির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাবিদদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত থাকে। এ ছাড়া বশংবদরা সরকারের কাছে গোপনে নানাপ্রকার সত্য-মিথ্যা রিপোর্ট দিতে থাকে। কোন কোন সময় সরকারপোষিত ছাত্র সংস্থাগুলো তাঁদের উপর হামলা চালায়। যে-সব শিক্ষক চাপ ও হয়রানির মুখেও নীতিতে অটল ছিলেন তাঁদের কখনো সরাসরি পদচ্যুত করা হয়. কখনও নিম্নতম পদে নামিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া তাঁদের উপর হয়রানির মাত্রাও বেড়ে যায়। অতীষ্ঠ হয়ে অনেকে শিক্ষক শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দেন. কেউ কেউ মনের দুঃখে দেশত্যাগ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষকের এতখানি অমর্যাদার দৃষ্টান্ত সম্ভবত আর কোথাও নেই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ-কবর

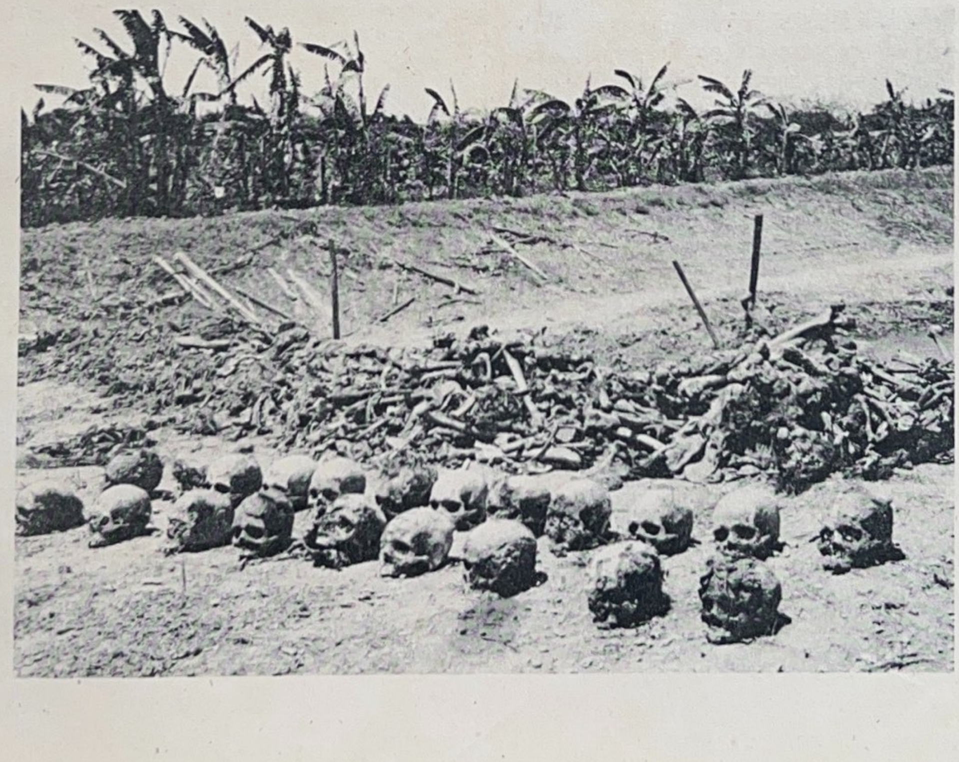

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তি এমনি ধারায় বাংলাদেশের শিল্পকলা, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী বুদ্ধিসত্তাকে নির্মূল করার কূট কৌশল অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশের চিত্রকলা, সঙ্গীত, লৌকিক অনুষ্ঠান প্রভৃতিকে কোণঠাসা করার এবং সেখানেও পাকিস্তানী আদর্শ অনুপ্রবেশ করানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা চলে। এখানকার বিশিষ্ট ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীদের একঘরে করে রাখা হয় এবং তাঁদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়। সংস্কৃতি বলতে তথাকথিত পাকিস্তানী সংস্কৃতিরই সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো। বাঙ্গালীর নববর্ষের উৎসব, বাংলার ঋতু বরণ অনুষ্ঠান, লোকসঙ্গীত চর্চা প্রভৃতিকে পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী আখ্যায়িত করে উৎখাতের জন্যে রীতিমত জেহাদ চালানো হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ঔপনিবেশিক বাজার এলাকায় পরিণত করার এবং বাঙ্গালীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত করার জন্যে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে যে চক্রান্তমূলক অভিযান চলে তা এখন সাধারণ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রেও মাথাওয়ালা লোকদের জেল-জুলুম ও অকথ্য হয়রানির মাধ্যমে উৎখাত করার এবং ভয়-ভীতি, লোভ ও প্রলোভনের মাধ্যমে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার অপচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

ঐতিহাসিক পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন স্তরের প্রতিভাবান এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের চরিত্রহীন, বিপথগামী এবং মানসিক দিক দিয়ে পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় করার অভিযান চলে। এর মধ্যে অনেকের উপর জেল-জুলুম এবং দৈহিক নির্যাতনও হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে বুদ্ধিজীবীদের খতম করারও যে ষড়যন্ত্র হয় নি তা নয়। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে সুদূর বৈরুতের একটি হোটেলে সর্বজনপ্রিয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এবং ১৯৬৯ সালের ৩১শে মে পিণ্ডির একটি হোটেলে ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের নিঃসহায় অবস্থায় রহস্যজনক মৃত্যু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালীর গৌরব এই দুটি প্রতিভাকে পাকিস্তানী শাসকদের হাতে বহু লাঞ্ছনা, অপমান ও নির্যাতন বরণ করতে হয়েছে। তাই এঁদের এই মৃত্যুর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র ছিলো বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

পঁচিশে মার্চের পর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের উপর যে সুপরিকল্পিত হত্যালীলা চালানো হয় সে সম্পর্কে প্রথমেই 'ইন্টারনেশন্যাল কমিটি অন দি ইউনিভারসিটি ইমার্জেন্সী' নামক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার ১৯৭১ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত বিবৃতির অংশ বিশেষ উধৃত করছিঃ........."বিশ্ববিদ্যালয় যে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলো তা সুস্পষ্ট। হতভাগ্যদের একটি বিশেষ তালিকা অনুসরণে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে বলে মনে হয়। তালিকাটি সম্ভবতঃ বিগত শরৎকালে প্রস্তুত করা হয়েছে। স্পষ্টতঃ উক্ত তালিকায় বিশিষ্ট শিক্ষক এবং ছাত্রদের নাম-ঠিকানা ছাড়া বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং লেখকদেরও নাম-ঠিকানা রয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায়, পরিকল্পনা অনুযায়ীই গণহত্যা চালানো হয়েছে। সিনিয়র প্রফেসরদের খোলা জায়গায় টেনে এনে গুলী করা হয়। নারী ও শিশুসহ তাঁদের পরিবারের লোকদেরও হত্যা করা হয়। স্পষ্টতই মনে হয় এই আকস্মিক আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী সংস্কৃতির অগ্রনায়ক ও অনুসারীদের এক বিরাট অংশকে নিশ্চিহ্ন করা।"

বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে পাকিস্তানী পশু-শক্তির উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিশ্বের এই মনীষিগণ যথার্থরূপেই বর্ণনা করেছেন। হানাদাররা ২৫শে মার্চের রাত ১১টার দিকে যে নির্মূল অভিযান চালায় তাতে বেছে বেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের আবাসগুলো এবং কয়েকটি পত্রিকা অফিসে বিশেষভাবে আঘাত হানে। এক হিসেব অনুযায়ী তারা শুধুমাত্র জগন্নাথ হলেই ৩৪০ জন ছাত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে (সাবেক ইকবাল হল) বীরের ন্যায় লড়াই করে ২০০ জন ছাত্র মৃত্যু বরণ করে। বুদ্ধিজীবীদেরও এমনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী অভিযানের শুরুতেই কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ১০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে হত্যা করা হয়।

এই হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই চালানো হয়। প্রধান প্রধান শহরগুলোতে, বিশেষত যে-সব জায়গায় পাকিস্তানী সেনানিবাস ও সৈন্যঘাঁটি ছিলো সেখানে যুগপৎভাবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী নির্মূল অভিযান চলে। যে-সব এলাকা পরবর্তীকালে হানাদার কবলিত হয় সেখানে হত্যাযজ্ঞ বিলম্বিত হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে অনেকেই প্রাণের ভয়ে সরে পড়েন কিংবা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই প্রথম আঘাতের পর সরে পড়েন। এর ফলে নিয়ামত কাজ কর্মে বিশৃংখলা ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়। হানাদাররা এতে তাদের কার্যধারা পরিবর্তন করে। ইতিমধ্যে বহির্জগতে

তাদের পাশবিক কার্য-কলাপের তীব্র সমালোচনা হয়। সে জন্যেও তারা সাময়িকভাবে প্রকাশ্য হত্যা-অভিযান বন্ধ রাখে। তাছাড়া শিকার যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সে কারণেও তারা বাহ্যত উদারতা প্রদর্শন করে। আগষ্ট মাসে ইয়াহিয়া খান যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন তার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিলো। এতে একদিকে বাইরের জগতকে ধোঁকা দেওয়া হয় এবং অন্যদিকে শিকার হাত করার পথ উন্মুক্ত করা হয়। বস্তুত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা ভারতে পালিয়ে না গিয়ে গ্রামে বা নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করেন তাঁদের অনেকেই ইয়াহিয়ার আশ্বাসে প্রতারিত হয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে আসেন। অনেকে জীবন ও জীবিকার তাগিদেও পুনরায় কাজে যোগদান করেন।

কিন্তু এ সময়ে সাধারণত প্রকাশ্যে হত্যাকান্ড না হলেও ভিতরে ভিতরে নির্মূল অভিযান অব্যাহত থাকে। তাছাড়া প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীর গতিবিধি ও কার্য-কলাপের উপর গোপনে কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়। বাঙ্গালী সংস্কৃতিমনা বুদ্ধিজীবীদের তালিকা গণ-আন্দোলনের সময়ই প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু সেটি সাধারণ তালিকা। তখন হয়ত এঁদের ব্যাপারে অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করা হয়েছিলো। কিংবা এঁদের মধ্যে কাদের হত্যা করা হবে তা নির্ধারিত হয় নি। যে-সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হবে তার চূড়ান্ত তালিকা সম্ভবত ২৫শে মার্চের পরেই তৈরী করা হয়। জল্লাদদের যে একটি ডায়েরী পাওয়া গেছে তাতে ডায়েরীর, ৯ই এপ্রিল তারিখ সমন্বিত পাতায় বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা দেখা যায়। সম্ভবত তখনো চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হয় নি। সংশোধন ও সংযোজনের কাজ চলছিলো।

হানাদাররা পরাভূত হবে কিংবা মাত্র ৯ মাসের মধ্যে তাদের ভরাডূবি হবে একথা কল্পনা করে নি। সে জন্যেই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলেও বাস্তবায়নে তাদের বিলম্ব হয়। ৩রা ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখেও তাদের টনক নড়ে নি। এমন কি চরম পরাজয়ের মুখেও বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌ-বহরের আবির্ভাবে তারা জয়ের আশা ছেড়ে দেয় নি। তারা ভেবেছিলো যে, শিকার তো হাতের মুঠোতেই রয়ে গেছে, তাই এঁদের খতম করতে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। অবশ্য ইতিমধ্যে চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদী বংশবদ আলবদরদের উপর বেছে বেছে হত্যা অভিযান চালানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যায়ে হত্যাযজ্ঞের মূল নায়ক মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী যখন আত্মসমর্পণের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে তখনই আলবদররা সর্বপ্রথম তৎপর হয় এবং বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ শুরু করে। ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার গভর্ণমেণ্ট হাউসের (বর্তমান বঙ্গভবন) উপর বোমা বর্ষণের পর যখন মালিক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে তখনই তাদের সকল আশা ধূলিসাৎ হয়। বস্তুত এ সময় থেকেই বুদ্ধিজীবীদের নিধনযজ্ঞ শুরু হয় এবং তা সম্ভবত দেশ মুক্ত হওয়ার পরও অব্যাহত থাকে। কারণ কারো কারো মতে মীরপুরে জনাব জহির রায়হানের অন্তর্ধানের ঘটনা এবং অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের রহস্যজনক মৃত্যুর পিছনেও আলবদরের হাত রয়েছে।

খুনী জল্লাদরা তাড়াহুড়ার মধ্যে তাদের নিধনযজ্ঞ চালায়। কারণ তারা ভাবতে পারে নি যে, মিত্রবাহিনী এতো অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ মুক্ত করবে। এ সময়ের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যেও তারা ব্যস্ত হয়ে উঠে। তারা যদি নিরুপদ্রবভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আর দু'একদিন সময় পেতো তা হলে বাংলাদেশের আরো অনেক অমূল্য জীবন এদের নরমেধযজ্ঞের শিকার হতো।

মার্চের বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞের ন্যায় ডিসেম্বরের নিধনযজ্ঞও যুগপৎভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র সংগঠিত হয়। এই যজ্ঞে শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, আইনজীবী, চিকিৎসক, রাজনৈতিক নেতা, পদস্থ সরকারী কর্মচারী কেউই বাদ পড়েন নি। সকল দিক দিয়ে বাংলাদেশের মস্তিষ্ককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের চূড়ান্ত সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন সূত্র থেকে এ যাবৎ মোটামুটি যে সংখ্যা পাওয়া গেছে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তার তালিকা প্রদত্ত হলো।

শহীদ শিক্ষাবিদ (বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া) ও আইনজীবীদের জেলাওয়ারী তালিকা

জেলা ও বিভাগ	শিক্ষাবিদ			আইনজীবী
	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	
ঢাকা	৩৭	৮	১০	৬
ফরিদপুর	২৭	১২	৪	২
টাঙ্গাইল	২০	৭	২	—
ময়মনসিংহ	৪৬	২৮	১	২
ঢাকা বিভাগ	**১৩০**	**৫৫**	**১৭**	**১০**
চট্টগ্রাম	৩৯	১৬	৭	১
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৯	৪	১	১
সিলেট	১৯	৭	—	২
কুমিল্লা	৪৫	৩৩	১	৪
নোয়াখালী	২৬	১৩	৪	২
চট্টগ্রাম বিভাগ	**১৩৮**	**৭৩**	**১৩**	**১০**
খুলনা	৪৮	১৫	২	২
যশোর	৫৫	৩১	৫	৪
বরিশাল	৫০	২১	৪	—
পটুয়াখালী	৩	১	—	—
কুষ্টিয়া	২৮	১৩	৪	—
খুলনা বিভাগ	**১৮৪**	**৮১**	**১৫**	**৬**
রাজশাহী	৩৯	৮	৩	৫
রংপুর	৪১	২২	৯	৪
দিনাজপুর	৫০	১০	১	২
বগুড়া	১৪	১২	—	২
পাবনা	৪৩	৯	১	২
রাজশাহী বিভাগ	**১৮৭**	**৬১**	**১৪**	**১৫**
বাংলাদেশ	**৬৩৯**	**২৭০**	**৫৯**	**৪১**

(১) শহীদ শিক্ষাবিদদের মোট সংখ্যা ... ৯৬৮
(২) শহীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা ২১

মোট শিক্ষাবিদ ... ৯৮৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

(১) এ এন এম মুনীর চৌধুরী
(২) ডঃ জি সি দেব
(৩) মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
(৪) আনোয়ার পাশা
(৫) ডঃ জোর্তির্ময় গুহঠাকুরতা
(৬) আবদুল মুকতাদির
(৭) এস এম রাশীদুল হাসান
(৮) ডঃ এন এম ফয়জুল মহী
(৯) ফজলুর রহমান খান
(১০) এ এন এম মুনীরুজ্জামান
(১১) ডঃ সিরাজুল হক খান
(১২) ডঃ শাহাদাত আলী
(১৩) ডঃ এম এ খায়ের
(১৪) এ আর খান খাদিম
(১৫) মোঃ সাদেক
(১৬) শরাফত আলী
(১৭) গিয়াসউদ্দীন আহমদ
(১৮) আনন্দ পয়ান ভট্টাচার্য

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

(১) অধ্যাপক কাইয়ুম
(২) হাবীবুর রহমান
(৩) শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার
(১৯) ডঃ আবুল কালাম আজাদ

সাবেক গণপরিষদ সদস্য

(১) মসিউর রহমান
(২) আমজাদ হোসেন
(৩) আমিনুদ্দীন
(৪) নজমুল হক সরকার
(৫) আবদুল হক
(৬) ডাঃ জিকরুল হক
(৭) সৈয়দ আনোয়ার আলী
(৮) এ কে সরদার

সাংবাদিক

(১) সিরাজুদ্দীন হোসেন
(২) শহীদুল্লাহ কায়সার
(৩) খোন্দকার আবু তালেব
(৪) নিজামুদ্দীন আহমদ
(৫) আ ন ম গোলাম মোস্তফা
(৬) শহীদ সাবের
(৭) শেখ আবদুল মান্নান (লাডু)
(৮) নজমুল হক
(৯) এম আখতার
(১০) আবুল বাসার
(১১) চিশতী হেলালুর রহমান
(১২) শিবসদন চক্রবর্তী
(১৩) সেলিনা আখতার

চিকিৎসাবিদ

(১) মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী
(২) আবদুল আলীম চৌধুরী
(৩) সামসুদ্দীন আহমদ
(৪) আজহারুল হক
(৫) হুমায়ুন কবীর
(৬) সোলায়মান খান
(৭) কায়সার উদ্দীন
(৮) মনসুর আলী
(৯) গোলাম মর্তুজা
(১০) হাফেজ উদ্দীন খান
(১১) জাহাঙ্গীর
(১২) আবদুল জব্বার
(১৩) এস কে লাল
(১৪) হেমচন্দ্র বসাক
(১৫) কাজী ওবায়দুল হক
(১৬) মিসেস আয়েশা বেদোরা চৌধুরী
(১৭) আলহাজ্ব মমতাজ উদ্দীন
(১৮) হাসিময় হাজরা
(১৯) নরেন ঘোষ
(২০) জিকরুল হক
(২১) সামসুল হক
(২২) এস রহমান
(২৩) এ গফুর
(২৪) মনসুর আলী
(২৫) এস কে সেন
(২৬) মফিজ উদ্দীন
(২৭) অমূল্য কুমার চক্রবর্তী
(২৮) আতিকুর রহমান
(২৯) গোলাম সরওয়ার
(৩০) আর সি দাশ
(৩১) মিহির কুমার সেন
(৩২) সালেহ আহমদ
(৩৩) অনীল কুমার সিংহ
(৩৪) সুশীল চন্দ্র শর্মা
(৩৫) এ কে এম গোলাম মোস্তফা
(৩৬) মকবুল আহমদ
(৩৭) এনামুল হক
(৩৮) মনসুর (কানু)
(৩৯) আশরাফ আলী তালুকদার
(৪০) লেঃ জিয়ায়ুর রহমান
(৪১) লেঃ কঃ জাহাঙ্গীর
(৪২) বদিউল আলম
(৪৩) লেঃ কঃ হাই
(৪৪) মেজর রেজাউর রহমান
(৪৫) মেজর নাজমুল ইসলাম
(৪৬) আসাদুল হক
(৪৭) নাজির উদ্দীন
(৪৮) লেঃ নূরুল ইসলাম
(৪৯) কাজল ভদ্র

(৫০) মনসুর উদ্দীন

অন্যান্য

(১) জহির রায়হান (সাহিত্যিক)
(২) পূর্ণেন্দু দস্তিদার (সাহিত্যিক)
(৩) ফেরদৌস দৌলা (সাহিত্যিক)
(৪) ইন্দু সাহা (সাহিত্যিক)
(৫) মেহরুন্নেসা (সাহিত্যিক)
(৬) আলতাফ মাহমুদ (শিল্পী)
(৭) দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহা
(৮) ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত (রাজনৈতিক নেতা)
(৯) যোগেশ চন্দ্র ঘোষ (আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী)
(১০) শামসুজ্জামান (চীফ ইঞ্জিনিয়ার)
(১১) মাহবুব আহমদ (সরকারী কর্মচারী)
(১২) খুরশীদ আলম (ইঞ্জিনিয়ার)
(১৩) নজরুল ইসলাম (ইঞ্জিনিয়ার)
(১৪) মোজাম্মেল হক চৌধুরী (ইঞ্জিনিয়ার)
(১৫) মহসিন আলী (ইঞ্জিনিয়ার)
(১৬) মুজিবুল হক (সরকারী কর্মচারী)

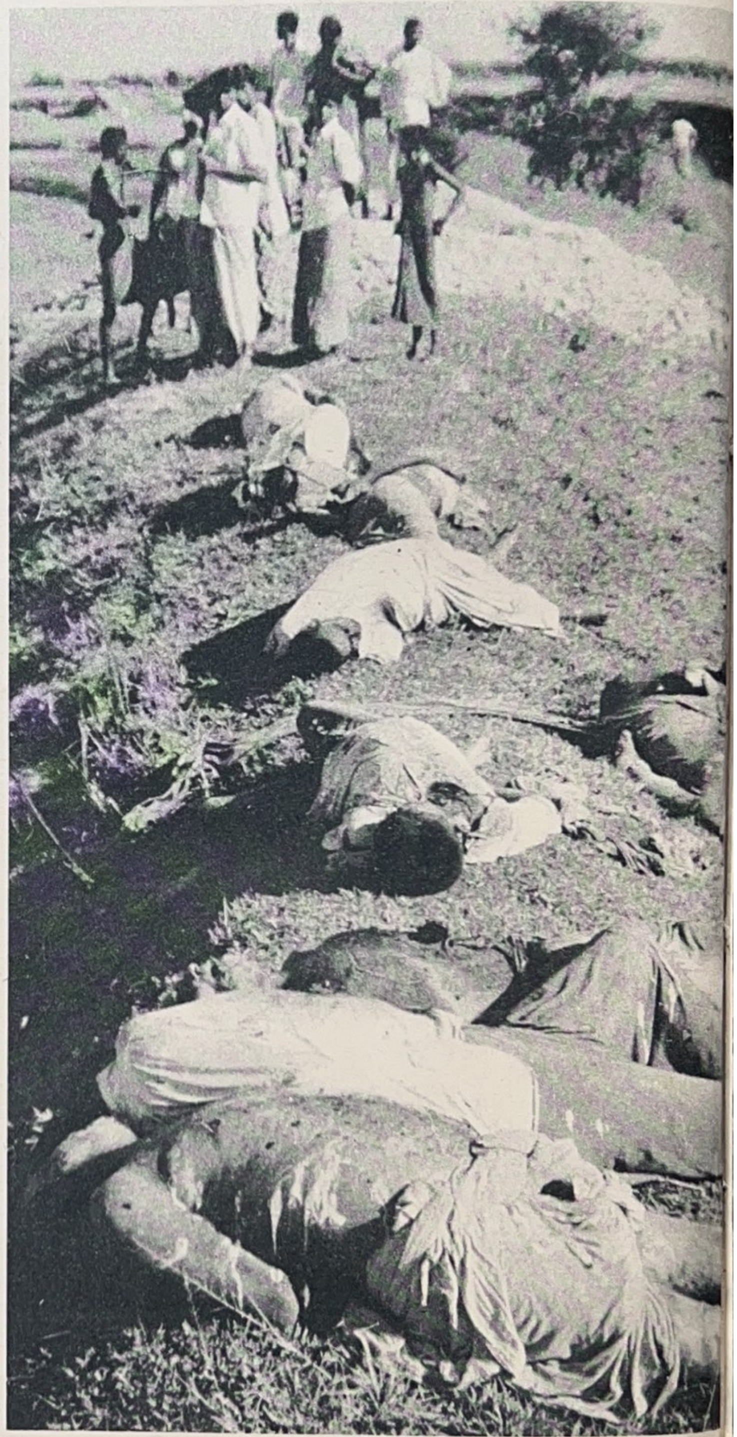

গণহত্যা

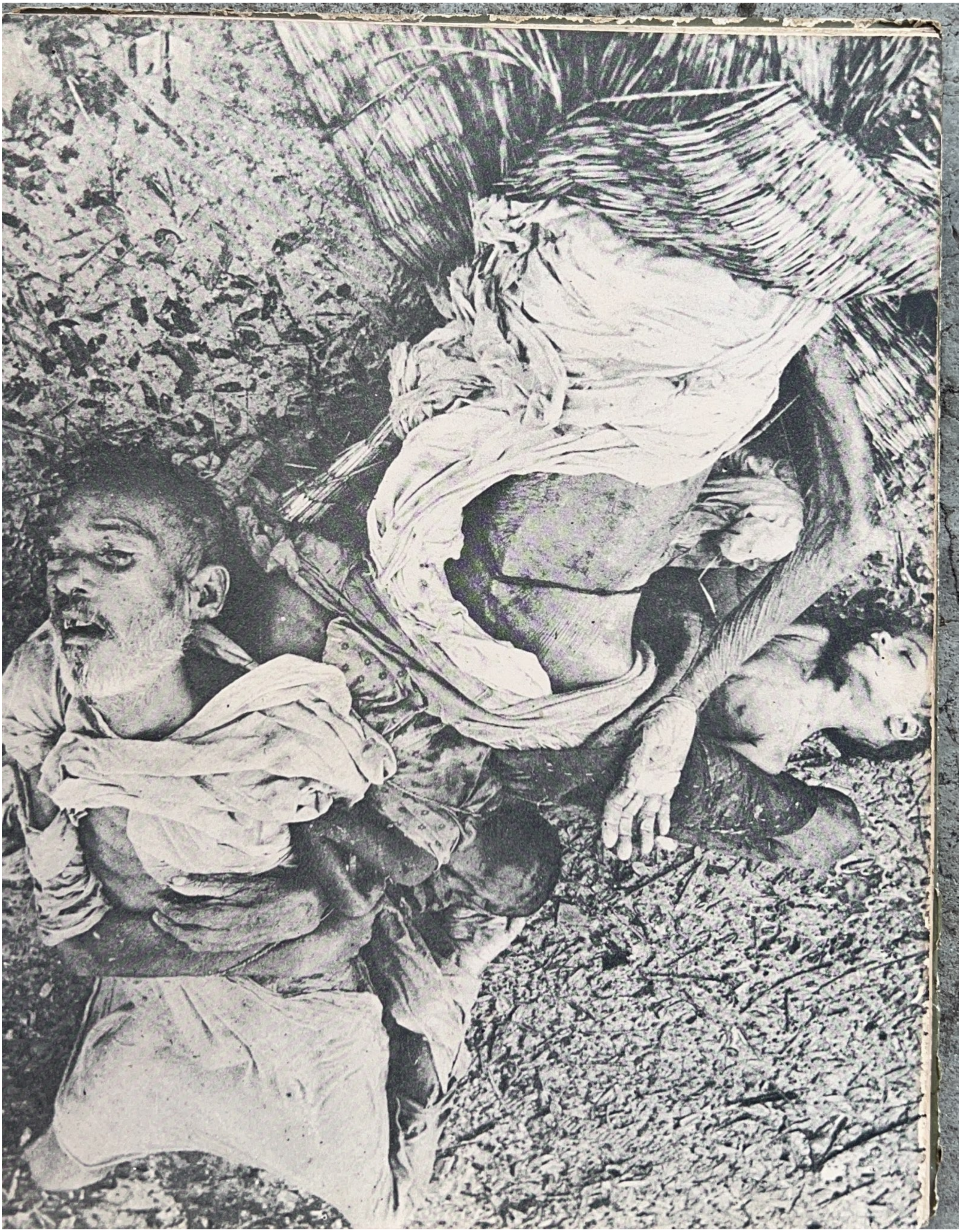

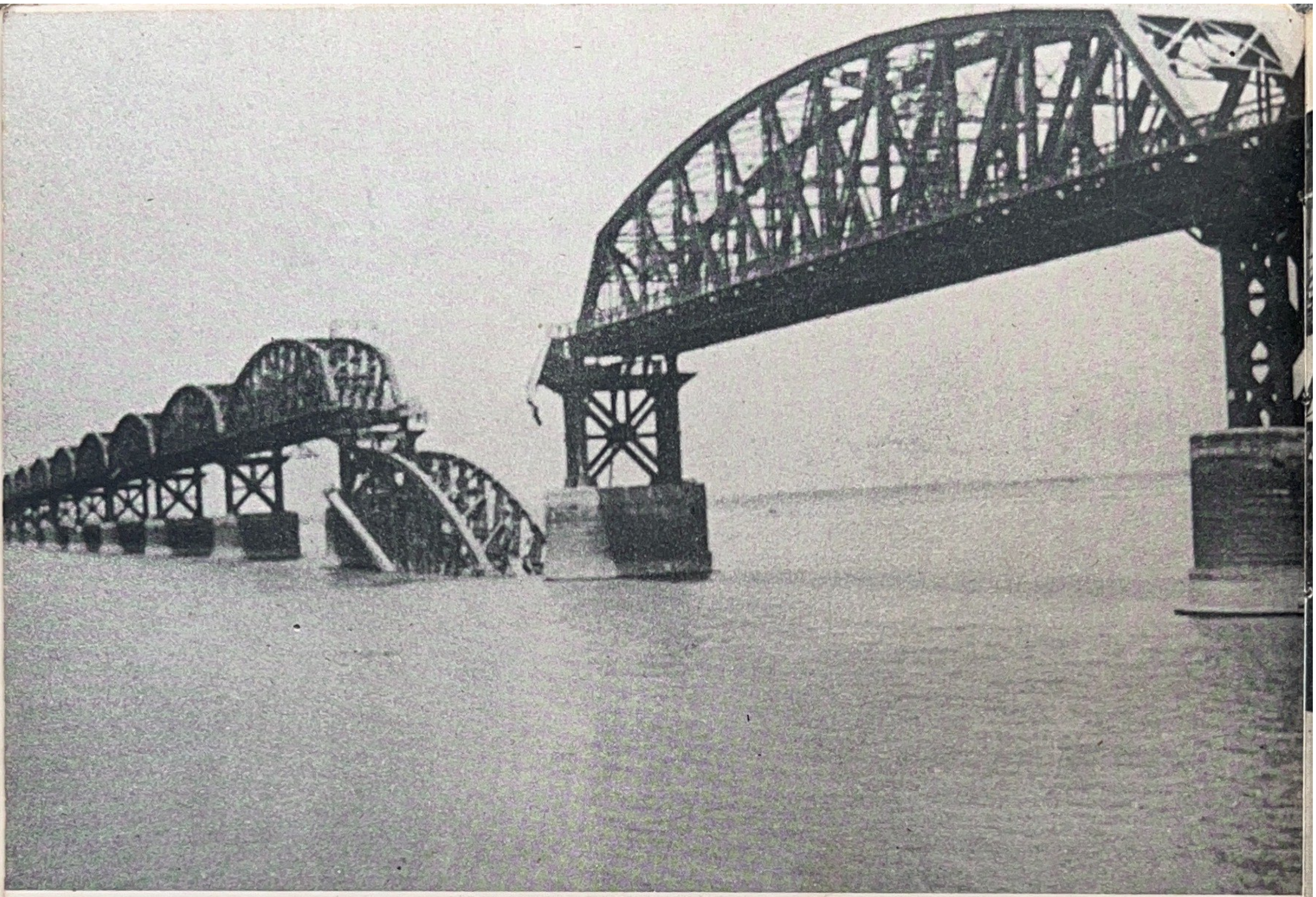

ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলওয়ে সেতু মেরামত

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন

মোহাম্মদ জমীর

১৯৭১ সালের নয় মাস স্থায়ী ইতিহাস বিশ্রুত ধ্বংসযজ্ঞ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত অবস্থায় রেখে যায়। এর সামাজিক কাঠামো এবং ইনফ্রাস্ট্রাক্‌চার মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই অবস্থার মাঝেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের স্বর্ণকরোজ্বল দিনে আসে বাংলার মুক্তি, আসে স্বাধীনতা। শুরু হয় জাতির জীবনে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম। সে সংগ্রাম বেঁচে থাকার জন্য ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির সংগ্রাম। এই দুরূহ সংগ্রামে উত্তরণের, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ধ্বংসলীলা জনজীবনে যে সাধ্যাতীত সমস্যার সৃষ্টি করে সে সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য গোটা বাংলাদেশকে একটি সংঘবদ্ধ ইউনিট হিসাবে সুসমন্বিত করতে হয়।

স্বাধীনতার উষালগ্নে বাংলাদেশকে যেসব অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় স্বদেশ প্রত্যাগত এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন তার মধ্যে অন্যতম। ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে বন্যার উদ্দাম স্রোতের মতো স্বদেশ প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী রেশন এবং গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের মধ্যে যারা রুগ্ন এবং চলাফেরায় অক্ষম তাদের জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষার এবং শিশুদের জন্য বিশেষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলওয়ে সেতু মেরামত

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন

মোহাম্মদ জমীর

১৯৭১ সালের নয় মাস স্থায়ী ইতিহাস বিশ্রুত ধ্বংসযজ্ঞ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত অবস্থায় রেখে যায়। এর সামাজিক কাঠামো এবং ইনফ্রাস্ট্রাক্‌চার মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই অবস্থার মাঝেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের স্বর্ণকরোজ্জ্বল দিনে আসে বাংলার মুক্তি, আসে স্বাধীনতা। শুরু হয় জাতির জীবনে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম। সে সংগ্রাম বেঁচে থাকার জন্য ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির সংগ্রাম। এই দুরূহ সংগ্রামে উত্তরণের, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ধ্বংসলীলা জনজীবনে যে সাধ্যাতীত সমস্যার সৃষ্টি করে সে সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য গোটা বাংলাদেশকে একটি সংঘবদ্ধ ইউনিট হিসাবে সুসমন্বিত করতে হয়।

স্বাধীনতার উষালগ্নে বাংলাদেশকে যেসব অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় স্বদেশ প্রত্যাগত এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন তার মধ্যে অন্যতম। ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে বন্যার উদ্দাম স্রোতের মতো স্বদেশ প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী রেশন এবং গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের মধ্যে যারা রুগ্ন এবং চলাফেরায় অক্ষম তাদের জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষার এবং শিশুদের জন্য বিশেষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

দ্রুততর ব্যবস্থাধীনে আমদানীর মাধ্যমে লুণ্ঠিত-নিঃশেষিত শস্যভাণ্ডার পূরণ করতে হয় এবং লোক চলাচল ও মাল পরিবহনের উদ্দেশ্যে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা যথাসম্ভব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। মাঠে, ময়দানে এবং কলকারখানায় উৎপাদন যন্ত্রগুলো হানাদার বাহিনী কর্তৃক বিকল করে দেওয়া হয়েছিল, মেরামতের মাধ্যমে সেগুলো সচল করে তোলা হয়। উৎপাদনে গতিবেগ সঞ্চারের প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে আমদানী করা হয় কাঁচামাল এবং প্রয়োজনীয় সর্ব উপায়-উপকরণ। এছাড়া জনসাধারণের অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান কল্পে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য ও কাপড়-চোপড় আমদানী করতে হয়। কারণ কোনটিই কোনটি অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় বা জরুরী ছিল না।

(ক) বস্তুতঃ এদেশের জীবন প্রবাহ এবং সহায়-সম্পদের উপর দিয়ে কি নিদারুণ ধ্বংসলীলা বয়ে গেছে বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতির তুলাদণ্ডে এর কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে মাত্র। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ রিলিফ সংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সেক্টর ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির যে তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন, তা দেখে প্রত্যেকেই বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেছেন। একটি পরীক্ষামূলক প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায়, একমাত্র সরকারী খাতে বস্তুগত মূলধন ও বিষয় সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৭৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এর ফলে পরিণামে আয়ের দিক দিয়ে ক্ষতি দাঁড়িয়েছে ১২৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা। ২০ বছরে নিয়োজিত মূলধন থেকে ৫% হারে যে আয় হতো তার ভিত্তিতে ক্ষতির এই হিসেব ধরা হয়েছে। এছাড়া কৃষিখাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩৭৬ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে আমদানী বন্ধ ও বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার দরুন পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা। আর এসব ক্ষতির হিসাব একত্রিত করলে দেখা যায়, একটা নির্দিষ্ট কালে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ছয়শ' কোটি টাকা। বলাবাহুল্য এই ক্ষয়ক্ষতির হিসাবের সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুজনিত ক্ষতি, বেসরকারী ঘরবাড়ী ও বিষয় সম্পদের ব্যাপক ধ্বংসলীলা এবং প্রাণভয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে পলায়িত মানুষের মানসিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব সংযুক্ত করা হয় নি। সংযুক্ত করা হলে যে ভয়াল দৃশ্য প্রতিভাত হয়ে উঠবে তা কল্পনা করাও কষ্টকর।

কৃষি ছাড়া বেসরকারী খাতে বস্তুগত মূলধনের দিক দিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৯০৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এর অর্থ আয়ের ক্ষেত্রে প্রায় ৬১০ কোটি টাকা ক্ষতি। এই ক্ষতির সাথে সরকারী খাতে নির্দিষ্টকালের আয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতি সংযুক্ত করলে নির্দিষ্টকালে আয়ের ক্ষেত্রে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২১০ কোটি টাকা।

(খ) এরপর আসা যাক বস্তুগত মূলধন খাতে। এক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মোটামুটি ১,২৪৯ কোটি টাকা। নিম্নে এক নম্বর তালিকায় বস্তুগত মূলধন ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর যে শতকরা হার

রাস্তাঘাটের পুনর্গঠন

প্রদান করা হয়েছে তাতে সরকারী খাতে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে। নয় মাসের ধ্বংসযজ্ঞে পরিবহন ব্যবস্থা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়। এর পরই উল্লেখ করা যায় বৈদ্যুতিক এবং শিল্পখাতে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়। বেসরকারী খাতে ৯২৯ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে সবচাইতে বেশী ক্ষতি হয় ঘরবাড়ীর। এরপর পর্যায়ক্রমিকভাবে কারিগর-ব্যবসায়ী, কৃষি ও হাট-বাজারের কথা উল্লেখযোগ্য। দুই নম্বর তালিকায় এসব ক্ষয়ক্ষতি বর্ণনা করা হয়েছে।

১নং তালিকা

	সরকারীখাতে ক্ষয়ক্ষতির শতকরা হিসাব (পুনর্গঠন মূল্যের ভিত্তিতে)
১। পরিবহণ	৩৮·২
২। বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ...	৭·০
৩। শিল্প	৪·২
৪। সমাজকল্যাণ ও শ্রম ...	৬·৯
৫। হাউজিং এন্ড সেটেলমেন্ট ...	৩·৩
৬। জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ...	৩·৪
৭। পানি	২·৩
৮। কৃষি	২৬·২
৯। স্বাস্থ্য	২·১
১০। শিক্ষা	৪·৭

২নং তালিকা

সরকারী খাতঃ

	দশ লক্ষ টাকার (মিলিয়ন) হিসাবে
১। পরিবহণ	১,২২৬·৫৮
২। বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২২৬·২৯
৩। শিল্প	১৩৪·৭০
৪। যোগাযোগ	৫০·৮৫
৫। সমাজকল্যাণ	২২০·৯০
৬। হাউজিং ও সেটেলমেন্ট	১০৭·৬২
৭। জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং	১০৮·২৬
৮। পানি	৭২·৬৬
৯। কৃষি	৮৪১·৯০
১০। স্বাস্থ্য	৬৮·৪৩
১১। শিক্ষা	১৫০·০০
	৩,২০৮·১৯

বেসরকারী খাতঃ

১। কৃষি	২৫০·০০
২। গৃহ-নির্মাণ*	৮.২৫০·০০
৩। হাটবাজার	৩৫·০০
৪। কারিগর-ব্যবসায়ী	৭৫০·০০
	৯,২৮৫·০০
	১২,৪৯৩·১৯

*পাঁচ ইঞ্চি ইটের দেওয়াল ও ঢেউ টিনের ছাদের সাহায্যে পুনর্নির্মাণ ব্যয়ের হিসাবের ভিত্তিতে গৃহ-নির্মাণের হিসাব ধরা হয়েছে।

উপরে ক্ষয়-ক্ষতির যে প্রাথমিক বিবরণ তুলে ধরা হলো তা থেকেই যে-কোন মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন নয় মাসের ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা অনুমান করে নেওয়া সম্ভব।

মাত্র এক বছর আগে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ সরকার এসব গুরুভার দায়িত্বের সম্মুখীন হন। কিন্তু সমস্যার ভারে নুব্জদেহ হয়ে পড়েন নি কিংবা পরাজয়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দেন নি। বরং দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে সমস্যার মোকাবিলা করেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের এই গুরু দায়িত্ব শুরু করা হয়। এজন্য গৃহীত হয় ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির কর্মসূচী এবং এ কর্মসূচীকে দেওয়া হয় অগ্রাধিকার।

পুনর্বাসন:

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৭২ সালের জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য ১০৭ কোটি টাকার একটি স্বল্প-মেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং এতে দুই কোটি স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন ও অন্ন সংস্থানের বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করাই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচীর উদ্দেশ্য:

(ক) ভারতের শরণার্থী শিবির থেকে লোকজনদের প্রত্যাগমনের পথ সুগম করা,

(খ) বাংলার গৃহহীন জনসাধারণের অস্থায়ী গৃহসংস্থান,

(গ) শরণার্থী এবং সর্বহারা মানুষদের নগদ অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সাময়িকভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দেওয়া,

(ঘ) চাষী, সহায়-সম্বলহারা কামার, কুমার তাঁতী, মিস্ত্রি ও কারিগরদের অর্থনৈতিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা,

(ঙ) অর্থ সংকটের দরুন শিক্ষা ও শিক্ষকতা পুনরারম্ভ করতে অসমর্থ ছাত্র-শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সাহায্য দান.

(চ) মহকুমা সদর দফতরে এতিম ও অভিভাবকহীনা মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য এতিমখানা ও আশ্রয় শিবির স্থাপন,

(ছ) চলাফেরায় অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ঢাকায় একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা,

(জ) শিল্প উৎপাদন সাবেক স্বাভাবিক হারের শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগে উন্নয়ন,

(ঝ) ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় বিদ্যুৎ শক্তির মাসিক কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ,

(ঞ) পণ্যসামগ্রীর স্বাভাবিক চলাচল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার,

(ট) খাদ্যোৎপাদন সর্বোচ্চ পরিমাণে নিশ্চিত করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

(ঠ) মহামারী রোধ করার জন্য শহরাঞ্চলে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১০৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা নিম্নোক্ত হারে বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন:

প্রথম পর্যায়ের সাহায্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচীর অধীনে সেকটর ও সাব-সেকটর ভিত্তিক বরাদ্দ

(কোটি টাকার হিসাবে)

		মোট পরিমাণ	দেশী মুদ্রায়	বৈদেশিক মুদ্রায়
১। সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়	...	৮৬·০০	৮৬·০০	...
(ক) টেষ্ট রিলিফ	...	২৬·০০	২৬·০০	...
(খ) গৃহ নির্মাণ	...	৩০·০০	৩০·০০	...
(গ) অন্যান্য	...	৩০·০০	৩০·০০	...
২। পূর্ত পরিকল্পনা	...	৮·০৮	৮·০৮	...
৩। শিক্ষা (শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ টাকা ছাড়াও সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় থেকে অতিরিক্ত ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা লাভ করে)	...	৩·২১	৩·২১	...
৪। স্বাস্থ্য (বাস্তুহারা লোকদের চিকিৎসা ব্যয়সহ)	...	০·৫৫	০·২০	০·৩৫
৫। এতিম এবং সর্বহারা মহিলাদের পুনর্বাসন	...	০·৫০	০·৫০	...
৬। পরিবহণ	...	৪·৫৭	৩·৪০	১·১৭
৭। শিল্প	...	২·২৫	০·৫৩	১·৭২
৮। তার ও ডাক যোগাযোগ	...	০·৪৫	০·৪৫	...
৯। পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ	...	০·৭০	০·৭০	...
১০। সেচ	...	০·২০	০·২০	...
১১। বিদ্যুৎ	..	০·৫০	০·৫০	...
		১০৭·৩১	১০৪·০৭	৩·২৪

নিছক বোধগম্য কারণেই সূচনাতে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের সংস্থান এবং খাদ্য সরবরাহের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য ব্যবস্থাবলীর পাশাপাশি মুখ্যতঃ যে-সব কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তন্মধ্যে টেষ্ট রিলিফ, পূর্ত কর্মসূচী ও গৃহ-নির্মাণ প্রকল্প অন্যতম। টেষ্ট রিলিফ ও গৃহ-নির্মাণ কর্মসূচী গ্রহণের অন্তর্নিহিত প্রয়াস ছিল সমাজের সমস্ত নারী-পুরুষদের স্ব স্ব পরিচিত পরিবেশে কর্ম-সংস্থান এবং অন্ন-বস্ত্রের সুযোগ সৃষ্টি করা। রিলিফ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ প্রচেষ্টা-ক্রমে ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ সহযোগিতায় এ সব কাজ সম্পন্ন করা হয়।

প্রাপ্ত খবরাখবর থেকে দেখা যায় টেষ্ট রিলিফের ১৭ কোটি টাকায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক এবং ২৫·৭৫ লক্ষ একর জমি উপকৃত হয়েছে। এ ছাড়া সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ৭১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিবিধ সমস্যা প্রভূত পরিমাণে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত দেশবাসীর জন্য ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৮৫ মণ খাদ্য-শস্য ছাড়াও বিপুল পরিমাণ গুঁড়া দুধ, শিশু খাদ্য, তাঁবু, ত্রিপল ও শাড়ী বিনা-মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। অনুরূপভাবে জাতীয় পুনর্বাসন বোর্ড হানাদার বাহিনীর দ্বারা নির্মমভাবে নির্যাতিতা হাজার হাজার মহিলার পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ জন্য চারটি বৃত্তিমূলক ট্রেনিং কেন্দ্র এবং সাতটি সেলাই ও হস্ত-

শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের রিলিফ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা সংস্থার ন্যায় স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠনসমূহকে মাসিক মঞ্জুরী বরাদ্দ করেন। সহায়-সম্বলহারা মহিলা ও শিশুদের পরিচর্যা এবং নিরাপত্তার জন্য মহকুমা পর্যায়ে ৬২টি কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

১৯৭২ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশ সরকার পুনর্বাসন কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে হাত দেন। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার যেসব প্রকল্প গ্রহণ করেন তাতে গ্রামাঞ্চলের গৃহ-সমস্যার সমাধান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী, ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা, এতিম শিশু ও যুদ্ধের ফলে সর্বহারাদের পুনর্বাসনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পল্লী এলাকায় গৃহ-নির্মাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে পল্লী-উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত থানাগুলোসহ গ্রামাঞ্চলে মোট ১ লক্ষ ৬৬ হাজার গৃহ-নির্মাণের জন্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য বরাদ্দকৃত ৬৬ কোটি টাকা মোটামুটি নিম্মোক্তভাবে ব্যয় করা হবেঃ

(১) গৃহ-নির্মাণ	...	৪৫ কোটি টাকা।
(২) পুনর্বাসন	...	১০ কোটি টাকা।
(৩) জরুরী রিলিফ	...	৮ কোটি টাকা।
(৪) অন্যান্য	...	৩ কোটি টাকা।
		৬৬ কোটি টাকা।

পুনর্গঠন কর্মসূচীঃ

বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে বস্তুগত সম্পদের ক্ষতিপূরণ করাই এই কর্মসূচীর মৌল উদ্দেশ্য। এই কাঠামোর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক তৎপরতার হার ১৯৬৯-৭০ সালের স্বাভাবিক ক্ষমতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। বিগত মুক্তি সংগ্রামকালে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবহন, কৃষি এবং বিদ্যুৎ ও শিল্পব্যবস্থা যথাশীঘ্র স্বাভাবিক করে তোলার কাজ সামগ্রিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে পুনর্গঠন কাজের জন্য নিম্নোক্তভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছেঃ—

খাত		বাজেট বরাদ্দ (দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)	শতকরা হার
(১) পরিবহণ যোগাযোগ			
	(ক)	৫১৯·১৮	৪৮·৬৭
	(খ)	৩৮·৮০	৩·৬৪
(২) বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ		৯৪·৯০	৮·৯০
(৩) কৃষি, বন, মৎস্য, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন	...	১৪৭·৮০	১৩·৮৬
(৪) শিল্প	...	৬৫·৭৭	৩·১৭
(৫) শিক্ষা	...	৫১·০০	৪·৭৮
(৬) গৃহনির্মাণ	...	৪৭·৮০	৪·৪৮
(৭) স্বাস্থ্য	...	৪০·৩০	৩·৭৮
(৮) সমাজ কল্যাণ ও শ্রম		৩২·৪০	৩·০০
(৯) পানি	...	২০·২০	১·৮৯
(১০) জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং		৮·৬০	০·৮১
		১,০৬৬·৭৫	

বাস্তবায়নকালে সর্বাধিক পরিমাণে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার উপরোক্ত কর্মসূচীর মৌল উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে সরকার দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতা যথাসম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন।

নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF

পরিবহণ ঃ

মুক্তি সংগ্রামের ফলে পরিবহণ ব্যবস্থা পঙ্গু এবং বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতি প্রায় অচলাবস্থার পর্যায়ে পৌঁছে। এর ফলে খাদ্য-শস্য, শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, কৃষিজাত দ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের আমদানী ও বিতরণ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পরিবহণ ক্ষেত্রে যে নিদারুণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়, নীচের তালিকা থেকে তা উপলব্ধি করা যাবে ঃ

	দশ লক্ষ টাকার হিসাবে
(১) বন্দর	
(ক) চট্টগ্রাম	৯০·০৬
(খ) চালনা	৫৮·৮০
(২) সড়ক	
(ক) সেতু, কার্লভার্ট ও অন্যান্য	৮০·৩০
(খ) গ্রামের রাস্তা-ঘাট ...	১৮·২৫
(গ) সড়ক নির্মাণ সরঞ্জাম ...	১৭·৭৩
(৩) সড়ক পরিবহণ	
(ক) ট্রাক	২২৩·০০
(খ) বাস	১২৮·০০
(গ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা	১০·৮০
(ঘ) খুচরা যন্ত্রপাতি ...	০·১৯
(৪) রেলওয়ে	৩০৩·০০
(৫) শিপিং কর্পোরেশন ...	৮০·০৫
(৬) (ক) নৌ-পরিবহণ সংস্থা ...	২৬·৩৪
(খ) আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ...	১৩·৯৪
(৭) বাংলাদেশ বিমান ...	৮৭·১৫
(৮) সিভিল এভিয়েশন ...	৮৫·৪৪
মোট ...	১,২২৬·৫৮

এই পর্যায়ের পুনর্গঠন কাজে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে বন্দরের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বিধান, নৌ-পরিবহণ উন্নয়ন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। বেসামরিক বিমান চলাচলের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১২১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ থেকে ৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বন্দরের জন্যে, ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা জল-পথের জন্যে, ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সড়ক ও হাইওয়ের জন্যে, ৩০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা রেলওয়ের জন্যে এবং ২০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্যে ব্যয় করা হবে।

এ ক্ষেত্রে মাত্র এক বছরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ৬৩ মাইল মিটার গজ এবং ১৬ মাইল ব্রড গজ রেলপথের মধ্যে ৪৩ মাইল মিটার গজ ও ১৬ মাইল ব্রড গজ রেলপথ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ২৯৫টি রেলওয়ে ব্রিজের মধ্যে ৮২টি স্থায়িভাবে এবং ১৯৮টি অস্থায়িভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ভারত সরকারের সাহায্য-সহায়তায় সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উদ্বোধন সবচাইতে বড় সাফল্য।

রেলওয়ে সেতু নির্মাণের ন্যায় সড়ক সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি লক্ষ্য করার মত। দু'শ চুয়াত্তরটি বিধ্বস্ত সড়ক সেতুর মধ্যে পঞ্চান্নটি স্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়েছে এবং ৯৬টিকে সাময়িকভাবে চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এ ছাড়া সাতটি স্থানে ফেরী সার্ভিস ও ষোলটি স্থানে ডাইভারশন রোড নির্মাণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রের কাজ এখনও পূর্ণোদ্যমে অব্যাহত রয়েছে।

বন্দরে মালপত্র উঠানো-নামানোর ব্যবস্থাও প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে যেখানে মাল হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার টন, সেক্ষেত্রে একই বছরের মে মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টনে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী আমলে উপরোক্ত দুটি বন্দরে মাল-পত্র হ্যান্ডলিং-এর মাসিক সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন। বন্দরসমূহকে দ্রুত সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতা অবশ্যই এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক বন্দর পরিষ্কার করার দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলেই এতটা তাড়াতাড়ি বন্দরগুলোর অবস্থা এ রকম উন্নত করা সম্ভব হয়েছে।

জলপথের পরিবহণ ক্ষেত্রেও একই রকম পুনর্গঠন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ-পরিবহণের স্বাভাবিকতা রক্ষার গুরুত্ব বিশদ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। মুক্তি সংগ্রামকালে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা এবং আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের যে সব নৌ-বহর ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা পূরণ করার কাজকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এ জন্য

ক্ষতিগ্রস্ত নৌ-যানসমূহ মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ ছাড়াও বিদেশ থেকে বার্জ, নৌকা, টাগ প্রভৃতি আমদানীর এবং অবতরণ ক্ষেত্র ও ওয়ার্কশপ তৈরীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ:

১৯৭১ সালের যুদ্ধে বিদ্যুৎব্যবস্থা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহুস্থানে উৎপাদন, বিতরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। উৎপাদনে মোট ক্ষতির পরিমাণ তিন কোটি টাকার উপর। পক্ষান্তরে বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৮ কোটি টাকা। ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ লাইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এর ফলে আজ পর্যন্ত যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা' রীতিমত উৎসাহব্যঞ্জক। এ পর্যন্ত ৬১টি লাইন মেরামত করা ছাড়াও ২৪টি লুপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৬টি ক্ষতিগ্রস্ত লাইনকে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জ উলন লাইন ৩৩ কে, ভি'র স্থলে ১৩২ কে, ভিতে উন্নীত করা হয়েছে। মেরামতের কাজকর্ম ছাড়াও ঈশ্বরদি উলন ও খিলগাঁও-এর সাব-ষ্টেশনসমূহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন, ভেড়ামারা পাওয়ার ষ্টেশন, রূপগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন, দিনাজপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং মেহেরপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের মেরামত কাজ দ্রুত অগ্রসরমান। গ্রিড লাইন এবং ডিষ্ট্রিবিউশন লাইনের পুনরুদ্ধার কাজের প্রতিও পরিপূর্ণভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

কৃষি:

মোট আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৫৫ ভাগ যে ক্ষেত্র থেকে আসে সেই কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির ইন্‌ফ্রাষ্ট্রাকচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শরণার্থী হিসাবে এক কোটি মানুষের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ এবং অপর দুই কোটি লোকের প্রাণ ভয়ে স্থান হতে স্থানান্তরে ছুটাছুটির অপ্রতিরোধ্য পরিণতি হিসাবে রাষ্ট্রীয় জীবন প্রবাহের এক্ষেত্রটিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে এ খাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার পরিমাণ প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩৭৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া এ ক্ষেত্রে বস্তুগত যে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় তার পরিমাণ আনুমানিক ৮৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।

(কোটি টাকার হিসাবে)

(ক) কৃষি (মৎস্য সম্পদ ছাড়া)	...	৭·৫৬
(খ) চা	...	২০·৭৪
(গ) পল্লী উন্নয়ন ও অন্যান্য	...	১·৬৭
(ঘ) খাদ্য	...	৩·৭৩
(ঙ) মৎস্য	...	১২·২৪
(চ) সমবায়	...	৩·৫৮
(ছ) গবাদি পশু	...	১·৭৬
(জ) বি এ ডি সি	...	৪·৫৮
(ঝ) ড্রাফ্‌ট পাওয়ার	...	২৫·০০
(ঞ) মৎস্য শিল্প সরঞ্জাম	...	৩·৩৩
মোট	...	৮৪·১৯

খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টার অংগ হিসাবে এ ক্ষেত্রে সরকার কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭১ সালের মার্চ পূর্ব পর্যায়ে উন্নীত করার এবং চাষাবাদের ক্ষেত্রে নতুন যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্য স্থির করেন। এজন্য সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রায় বরাদ্দ করা হয় ৬২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। নিম্নোক্ত জিনিসসমূহ ক্রয় বাবদ এ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে:—

(দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)

দ্রব্য	পরিমাণ		
(১) খুচরা যন্ত্রপাতিসহ পাওয়ার পাম্প	৪০০০	...	৪৬·০০
(২) ওয়ার্কশপ টুলস ও সাজ-সরঞ্জাম		...	৬·৫০
(৩) খুচরা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম		...	২·০০
(৪) বিমান ও বিমান থেকে স্প্রে'র উপযোগী জিনিসপত্র		...	৫·৬০
(৫) পরিবহণ যান		...	২·৮০
মোট		..	৬২·৯০

কীটপতঙ্গ নিরোধক ঔষধপত্র এবং অধিকতর পরিমাণে সার ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার দেশাভ্যন্তরে ইউরিয়া সার, টি, এস, পি এবং পটাশ উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছেন। কীটনাশক ঔষধ এবং উন্নতমানের বীজ সরবরাহের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদিও এখানে উল্লেখের দাবী রাখে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, এই কর্মসূচীর অধীনে

সরকার ইরি-২০ জাতীয় ধানের ছয় লক্ষ মণ বীজ এবং ইরি-৮ জাতীয় ধানের দুই লক্ষ মণ বীজ সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। রেজিষ্ট্রিকৃত উৎপাদনকারীদের মাধ্যমে এই বীজ সরবরাহ করা হবে। এ ছাড়া শীতকালীন শস্য উৎপাদনের সুবিধার্থে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে আলোচনাক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয় লো-লিফট পাম্প এবং গভীর নলকূপ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাপক পুনর্গঠন কাজের সর্বশেষ ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

শিল্প :

আনরডের জরীপ অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ধ্বংসলীলায় শিল্প ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা অর্থাৎ ৫ কোটি ২২ লক্ষ ১৫ হাজার মার্কিন ডলারের সমান (তালিকা ১৩, পৃষ্ঠা ৪৬, ভলিউম ১, আনরড ইনফরমেশন পেপার নং ১৭)। কাঁচামাল, বস্তুগত ইনফ্রাষ্ট্রাকচার এবং যন্ত্রপাতি এই ধ্বংসলীলার শিকারে পরিণত হয়। সরকারী খাতের অন্তর্গত পাটশিল্প, শিপইয়ার্ড এবং ডিজেল প্ল্যান্ট প্রভৃতির পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া বেসরকারী খাতের হাজার হাজার কুটীরশিল্প বিধ্বস্ত হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতির যোগান দানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে শিল্প উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয় ৫৭৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেনঃ—

(ক) ফ্যাক্টরী, গুদাম, মেশিনপত্র প্রভৃতি মেরামতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান।

(খ) মূলধন বিনিয়োগে 'ইকুইটি' সহযোগিতা।

(গ) কাঁচামাল ক্রয় এবং কারখানা চালু রাখার ব্যয় সংকুলানের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল বাবদ স্বল্প মেয়াদী ঋণ দান।

(ঘ) আমদানীকৃত ও স্থানীয় কাঁচামাল নিয়মিতভাবে সরবরাহ।

(ঙ) এ ছাড়াও সরকার সেক্টর ভিত্তিক সংস্থাসমূহকে সেগুলোর অধীনস্থ কল-কারখানা ও উৎপাদন যন্ত্রগুলো সক্রিয় করে তোলা ও রাখার জন্য নিম্নোক্ত হারে অর্থ বরাদ্দ করেছেনঃ—

(দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)

	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা
(ক) বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা	১৩০·৫০	৬০·৩০
(খ) বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা	৪·১৩	০·৯০
(গ) বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরী সাহায্য সংস্থা	০·০২	...
(ঘ) চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা	০·০২	...
(ঙ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা	১৭·৫০	৮·৯০

উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহের পুনর্গঠন কাজ থেকে সুফল লাভ কিছুটা সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নেই। তবে এরই মাঝে এর শুভ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। আশা করা যায়, মূলধনের

Luft
Europa
PARCEL
C.O.R.R. DACCA BANGLA DESH

ঢাকা বিমানবন্দরে রিলিফ বিমান

যথাযথ বিনিয়োগ এবং একনিষ্ঠভাবে কাজকর্মের ভেতর দিয়ে শীঘ্রই বাংলাদেশ তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

শিক্ষাঃ

১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী যে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ চালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মুক্তি সংগ্রামীরা আশ্রয় নিতেন, সেজন্যই এগুলো প্রবল আক্রোশের কবলে পতিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবয়বগত ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ধ্বংসলীলার ভেতর দিয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ তাদের উপায় উপকরণসমূহ হারিয়ে ফেলেন। এক হিসাবে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ধ্বংসযজ্ঞে প্রায় ২১ হাজার ৮ শত ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা যথাক্রমে ৮০০০, ৩৪৮০ ও ২৯০। এ ছাড়া ৩০টি প্রাথমিক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ও ৩০টি সরকারী অফিস বিনষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, ফিল্ড অফিসার, সংশিলষ্ট স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য সূত্র হতেই এই ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব নিরূপিত হয়েছে।

এই ধ্বংসের বুকে সৃষ্টির ব্যাপক প্রচেষ্টা হিসাবে সরকার প্রায় ২৯ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। শিক্ষা ডাইরেক্টরেট ডিগ্রি পর্যায়ের বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যন্ত পুনর্গঠন কাজ তদারক করছেন। শিক্ষা ডাইরেক্টরেট এ জন্য যে অর্থ এ পর্যন্ত পেয়েছেন তার পরিমাণ হ'ল

২৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া হানাদার আমলে ক্ষতিগ্রস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের বই-পুস্তক ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বলা অনাবশ্যক যে, এ বরাদ্দের ভেতর দিয়েই সরকারী প্রচেষ্টার বিরাম ঘটে নি। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

গৃহ নির্মাণঃ

অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সরকারী এবং বেসরকারী আবাস এবং সম্পত্তিরও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বিল্ডিং ডাইরেক্টরেটের বহু বাড়ীঘর বিনষ্ট হয়ে যায়। পুনর্গঠন ব্যয়ের হিসেবে এ ক্ষেত্রের সরকারী খাতের, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দশ কোটি টাকারও বেশী। তবে এ ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতেই ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক—যার পরিমাণ প্রায় ৮২৫ কোটি টাকা। পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসের পানি সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থারও মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

গৃহ সমস্যা সমাধানের সুবিধার্থে এ ক্ষেত্রের পুনর্গঠন কাজকে দশটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। গৃহ নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত ও সুষ্ঠুতর করার জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থ যে দশটি সাব-সেক্টরের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে তা হলো, বিল্ডিং ডাইরেক্টরেট, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পূর্ত বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ডাইরেক্টরেট, পুলিশ ডাইরেক্টরেট, পর্যটন সংস্থা এবং বাংলাদেশ রাইফেল্সের সার্ভে বিভাগ।

* * * *

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ রিলিফ অপারেশন দল তাদের রিপোর্টে তা উল্লেখ করেন। "বাংলাদেশঃ ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত জরীপ" (তথ্য পত্র নম্বর ১৭, আনরড) রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে এই দেশ "দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হয় নি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের, বাইবে চলে যায় নি এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত সরকারী কর্মপ্রচেষ্টার অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশ একটি সুশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।"

[মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদঃ হাবিবুর রহমান মিলন]

বাংলাদেশে গণহত্যা- বিদেশীদের চোখে

সংকলন ও সম্পাদনাঃ

খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা

"রক্তই যদি কোন জাতির স্বাধীনতা অর্জনের অধিকারের মূল্য বলে বিবেচিত হয়, তবে বাংলাদেশ অনেক বেশী দাম দিয়েছে।" বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর গণহত্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একথা স্বীকার করেন লন্ডনের নিউ টাইমস পত্রিকা ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল সংখ্যায়।

মাত্র নয় মাসের পরিসরে জেনারেল ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে তিরিশ লক্ষেরও বেশী মানুষ হত্যা করে। বাঙ্গালী জাতিকে চিরতরে দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য ইয়াহিয়া এবং তার সেনাপতিরা বাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে চেয়েছিল।

সেদিন সমগ্র বিশ্ববাসী ও তার নেতৃবৃন্দ একটা দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপরে পুরোপুরি সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

সারা বিশ্বের সকল সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন এই গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন।

সেই ভয়াবহ ঘটনার দু'জন চাক্ষুষদর্শীর বিবরণী সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। এঁরা দু'জন হলেন লন্ডনের "ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার সংবাদদাতা সাইমন ড্রিং ও "নিউ ইয়র্ক টাইমসের" সংবাদদাতা সিড্নি এইচ্ শ্যানবার্গ।

১৯৭১ সালের ২৬শে ও ২৭শে মার্চ পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী যখন রাজধানী ঢাকা থেকে সকল বিদেশী সাংবাদিককে বহিষ্কৃত করে সাইমন ড্রিং তখন রাজধানী ঢাকাতেই আত্মগোপন করেন।

সান্ধ্য আইন স্বল্প সময়ের জন্য প্রত্যাহার হওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ৭২ ঘন্টাব্যাপী রাজধানী ঢাকার বুকে যে তাণ্ডবলীলা চলেছিল তা দেখতে ও সে সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেন। সেই ৭২ ঘন্টায় যা ঘটেছে তার সবকিছু তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব না হলেও—তাঁর বিবরণী থেকে এই বর্বরতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কিভাবে তথাকথিত "স্বাভাবিক অবস্থা" ফিরিয়ে এনেছে—তা দেখবার জন্য ১৯৭১ সালের জুন মাসে যে সকল

বিদেশী সাংবাদিককে ঢাকা প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছিল শ্যানবার্গ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ শ্যানবার্গকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কৃত করে, কারণ শ্যানবার্গ তাঁর প্রেরিত সংবাদমালার মাধ্যমে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের দাবীর অসারতা ও অন্তঃসারশূন্যতা উদঘাটন করে দেন।

৩০শে মার্চ "ওয়াশিংটন পোস্ট" পত্রিকায় "ঢাকা কিভাবে 'ঐক্যবদ্ধ' পাকিস্তানের জন্য খেসারত দিয়েছে" শিরোনামে প্রকাশিত সাইমন ড্রিংয়ের **রিপোর্টে বলা হয়ঃ—**

পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল...................।

নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে. অন্যান্যরা নিহত। মুজিবুরের সমর্থক দু'টো সংবাদপত্র অফিস ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

পঁচিশে মার্চ বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার রাস্তার চলমান ট্যাংকগুলোর প্রথম লক্ষ্য ছিল ছাত্ররা।

ঢাকার উপর আক্রমণ চালাবার জন্যে, সাঁজোয়া, গোলন্দাজ এবং পদাতিক বাহিনীর আনুমানিক তিনটি ব্যাটালিয়ন ব্যবহার করা হয়। রাত দশটার কিছু আগে তারা তাদের সৈন্য ছাউনি ত্যাগ করা শুরু করে। এগারোটার মধ্যে গুলীবর্ষণ শুরু হলো এবং যারা উলটানো গাড়ী, গাছের গুঁড়ি, আসবাব, কংক্রীটের নল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করার চেষ্টা করেছিল, তারা নিহত হলো।

শেখ মুজিবুর রহমানকে টেলিফোনে সাবধান করে বলা হলো, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি তাঁর বাসা ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। গ্রেফতার এড়িয়ে আসা একজন দলীয় কর্মীকে তিনি বলেছিলেন, "যদি আমি লুকোতে যাই তবে তারা আমাকে খুঁজে বের করবার জন্যে পুরো ঢাকা জ্বালিয়ে দেবে।"

ছাত্রদেরও সাবধান করা হয়েছিল, কিন্তু তখনও সেখানে যাঁরা ছিলেন পরে জানিয়েছেন যে, তাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের শুধু গ্রেফতার করা হবে মাত্র। আমেরিকা কর্তৃক সরবরাহকৃত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এম-২৪ ট্যাংকের পিছু পিছু একদল সৈন্য মধ্য রাতের কিছু পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওয়ানা হয়। সৈন্যরা বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী দখল করে নেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় শেল-নিক্ষেপের জন্যে ঐ জায়গাকে ফায়ার-বেস' হিসেবে ব্যবহার করে।

আমাকে বলা হয়েছে যে, সরকার বিরোধী চরমপন্থী ছাত্রদলের কেন্দ্রস্থল ইকবাল হলে আচমকা হানা দিয়ে দুশো ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। দু'দিন পর দেখা গেল, পোড়া ঘরগুলোতে পড়ে আছে কিছু দেহ, কিছু বাইরে ছড়িয়ে, কিছু ভাসছিলো কাছের এক পুকুরে, শিল্পী এক ছাত্রকে দেখা গেল ইজেলের কাছে পড়ে আছে লুটিয়ে।

মাত্র ৩০টি মৃতদেহ ইকবাল হলে দেখা যায়। কিন্তু হলের করিডোরে যতো রক্ত দেখা গেল তা থেকে মনে হয় না যে নিহতের সংখ্যা এতো অল্প। সেনাবাহিনী বহুসংখ্যক মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে।

আরেকটি হলে, পাক সৈন্যরা তাড়াহুড়ো করে গণকবর খুঁড়ে মৃতদের কবর দিয়ে ট্যাংক দিয়ে সমান করে দেয়। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাস করতেন তাঁরাও এই আক্রমণের শিকার হন। রেল লাইনের পাশে দুশো গজ জুড়ে যে বস্তি এলাকা ছিল তা ধ্বংস করে দেয়া হয়।

নিকটবর্তী বাজার এলাকাও সৈন্যরা গুঁড়িয়ে দেয়। দু'দিন পর যখন ঘর থেকে বের হয়ে এ-সব দেখা সম্ভব হলো তখন দেখা গেল, বাজারের কিছু দোকানের মালিক তখনও শুয়ে আছে, যেন ঘুমোচ্ছে, কাঁধের ওপর পর্যন্ত তাদের কম্বল টানা। একই এলাকায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজে সরাসরি বাজুকা আক্রমণ করা হয়।

একদল সৈন্য যখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অভিযান চালাচ্ছিল তখন অন্য আরেকটি দল শহরের অন্যপাশে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের কেন্দ্র রাজারবাগের দিকে রওয়ানা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, ট্যাংক থেকে প্রথম গুলীবর্ষণ করা হয়; তারপর সৈন্যরা ভিতরে ঢুকে তাদের আস্তানাগুলো সমান করে দেয়, সাথে সাথে আশেপাশের বিল্ডিংগুলোতে এলোপাথারি গুলী চালায়। অপরদিকে আশেপাশে বসবাসকারী লোকেরাও জানে না সেখানে কতোজন মারা গেছে, তবে সেখানে অবস্থানরত ১,১০০ জন পুলিশের ভিতর খুব বেশী কেউ পালাতে পারে নি।

একদিকে যখন এ-সব ঘটছে তখন অন্যদিকে শেখের বাসস্থান ঘেরাও করা হয়েছে। রাত একটার কিছু আগে যখন টেলিফোনে তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, যে কোন মুহূর্তে তিনি আক্রমণ আশংকা করছেন এবং শুধু দেহরক্ষী এবং চাকর ছাড়া সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

একজন প্রতিবেশী বললো যে, রাত ১-১০ মিনিটে

একটি ট্যাংক, একটি সাঁজোয়া গাড়ি, এবং সৈন্যভর্তি ট্রাক গুলী করতে করতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসে। "শেখ, নীচে নেমে আসুন," বাইরে থেকে একজন অফিসার ইংরেজীতে চিৎকার করে বলে উঠলো। মুজিবুর তাঁর ব্যালকনিতে বের হয়ে এসে বললেন, "আমি তৈরী, গুলী করার দরকার নেই। তোমরা এতো কিছু না করে আমাকে টেলিফোন করলেই আমি চলে আসতাম।"

অফিসারটি তখন প্রাঙ্গণের ভিতর গিয়ে মুজিবকে বললো, "আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।" তিনজন চাকর, একজন পার্শ্বচর ও একজন দেহরক্ষীশুদ্ধ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো; দেহরক্ষীটি অফিসারকে অপমান করা শুরু করলে তাকে বেদম পেটানো হলো। পাশের বাড়ীর প্রাচীরের আড়ালে লুকোনো একজন নৈশ-পাহারাদারকে হত্যা করা হলো।

শেখকে যখন সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সৈন্যরা তাঁর বাড়ীর ভিতরে ঢুকে সমস্ত নথি-পত্র নিলো, সামনে যা পেলো তাই চূর্ণ-বিচূর্ণ করলো, বাগানের দরজায় তালা ঝোলালো, সবুজ, লাল এবং হলুদ "বাংলাদেশের" পতাকাকে ভূপাতিত করে চলে গেল।

শহরের চারদিকে আগুন জ্বলছিল এবং সৈন্যরা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন জায়গাটুকু দখল করে নিয়েছিল। কোন কোন অঞ্চলে তখনও প্রচন্ড শেলিং হচ্ছিল, তবে যুদ্ধের গতি ক্রমশঃ নিথর হয়ে আসছিল। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের উল্টোদিকে "দি পিপল' পত্রিকার শূন্য অফিস এবং তৎসংলগ্ন প্রায় সমস্ত বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হলো এবং নৈশ-পাহারাদারও রেহাই পেলো না।

ভোরের কিছু আগে গুলীবর্ষণ প্রায় থেমে গেল, এবং সূর্য ওঠার সাথে সাথে এক ভীতিজনক নিঃশব্দতা শহরের উপর চেপে বসলো; ফিরে আসা দু'তিনটে ট্যাংকের শব্দ, মাঝে মাঝে কনভয়ের শব্দ ও কাকের চিৎকার ছাড়া সম্পূর্ণ শহর মনে হচ্ছিল পরিত্যাক্ত এবং মৃত।

দুপুরের দিকে, আবার কোন রকম সাবধানবাণী না জানিয়ে শহরের পুরনো অঞ্চলে সৈন্যরা ঢুকতে লাগলো যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গলি-ঘুজির মধ্যে একলক্ষ লোক বাস করে।

পরবর্তী এগারো ঘন্টা 'পুরনো শহর' নামে পরিচিত এ অঞ্চলের বিরাট অংশটুকু তারা ধ্বংস করলো যেখানে শেখ মুজিবের সমর্থনকারীদের সংখ্যা ছিল বেশী। ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, নাজিরা বাজার, নয়াবাজারকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো।

"হঠাৎ তাদের রাস্তার প্রান্তে দেখা গেল," জানালো নাজিরাবাজার এলাকার এক বৃদ্ধ, "তারপর তারা এগিয়ে এলো প্রত্যেক বাড়ীতে গুলী করতে করতে।"

গ্যাসোলিনের টিন হাতে সৈন্যরা অগ্রবর্তী ইউনিটকে অনুসরণ করতো। যারা পালাবার চেষ্টা করতো তাদের গুলী করা হতো। যারা থাকতো তারা পুড়ে মারা যেতো। সেদিন দুপুর থেকে রাত দু'টোর মধ্যে প্রায় সাতশো পুরুষ, মহিলা এবং শিশু মৃত্যুবরণ করেছে বলে আমাকে জানানো হয়েছে।

আধা বর্গমাইল বা তার চেয়েও বেশী কমপক্ষে তিনটি এলাকায় একই রকম 'প্যাটার্ণ' অনুসরণ করা হয়েছে। পুরনো শহরের পুলিশ থানাগুলিকেও আক্রমণ করা হয়েছে।

"আমি আমার কনস্টবলদের খুঁজছি". শনিবার সকালে একটি বাজার এলাকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বললেন জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টার, "আমার এলাকায় ছিল ২৪০ জন, এবং এ পর্যন্ত আমি খুঁজে পেয়েছি ৩০ জনকে—এবং সবাই মৃত।"

পুরনো শহরের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সৈন্যরা লোকদের জোর করে ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করেছে। এবং এ এলাকাকেও সবশেষে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

পুরনো শহরে, ২৬শে মার্চ, শুক্রবার, রাত এগারোটা পর্যন্ত সৈন্যরা ছিল এবং স্থানীয় বাঙালী 'ইনফরমারদের' নিয়ে ঘুরছিল। সৈনিকেরা অগ্নিগোলক জ্বালিয়ে দিতো আর চরেরা দেখিয়ে দিত আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ঘরবাড়ীগুলি। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে তখন ঐ বাড়ীটিকে হয় সরাসরি ট্যাংক বা রিকয়েলেস রাইফেল থেকে গুলী করে বা এক টিন গ্যাসোলিন দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হতো।

ইতিমধ্যে, শহরতলি থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা, শেখের সমর্থনের কেন্দ্র থেকে দশমাইল দূরে শিল্প এলাকার দিকে চলে যাচ্ছিল।

এ সব এলাকায় রোববার ভোর পর্যন্ত গুলীবর্ষণ চললো, কিন্তু শুক্রবার রাতে অর্থাৎ শুরু

হওয়ার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর শহরে অভিযানের আসল পর্যায় প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

বাংলা সংবাদপত্র "ইত্তেফাক" ছিল অভিযানের একটি শেষ লক্ষ্য। অভিযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রায় চারশো লোক ঐ অফিসে আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা গেছে। শুক্রবার, বিকেল চারটায় বাইরের রাস্তায় চারটি ট্যাংক দেখা গেল। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, সাড়ে চারটার দিকে অফিসটি নরক হয়ে গেল। শনিবার সকালবেলা কতকগুলো ভস্মীভূত লাশ পেছনের কামরাগুলোতে পড়ে থাকলো।

যে ভাবে দ্রুত সৈন্যরা নেমে এসেছিল রাস্তায় ঠিক তেমনিই তারা আবার ফিরে গেল। শনিবার সকালে রেডিওতে ঘোষণা করা হলো, সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কার্ফু শিথিল করা হবে। এরপর রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে সামরিক আইনের ধারাগুলি পুনর্বার ঘোষণা করা হলো প্রেস সেন্সরশীপ জারী করা হলো এবং সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে আদেশ করা হলো। সমস্ত ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে বলা হলো।

অলৌকিকভাবে শহরে জীবন ফিরে এল এবং সেই সঙ্গে দেখা গেল আর্তি, ভয়, আশংকা। দশটার দিকে দেখা গেল রাস্তাগুলো লোক-জনে ভরে গেছে, সবাই শহর ত্যাগ করছে। অন্যদিকে তখনও পুরনো শহরের অনেক এলাকা এবং দূরে শিল্প এলাকার উপরে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। গাড়ী এবং রিকশা করে, বেশীর ভাগ পায়ে হেঁটে জিনিষপত্র হাতে নিয়ে ঢাকার লোকেরা পালাচ্ছিল। দুপুরতক শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ালো গিয়ে লক্ষাধিকের উপর। "আমি বুড়ো লোক, আমাকে একটু পৌঁছে দেবেন," "আল্লার ওয়াস্তে আমাকে একটু সাহায্য করুন", "আমার ছেলেটাকে আপনার সাথে নিয়ে যান।"

সৈন্যদের কীর্তি নিঃশব্দে এবং কঠিন মুখে দেখতে দেখতে তারা যাচ্ছিল।

সরকারী অফিসগুলি প্রায় শূন্য রইলো। কাজে ফেরার আদেশকে উপেক্ষা করে বেশীরভাগ কর্মচারীই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিল। যারা পালাচ্ছিল না তারা ধূমায়িত ধ্বংসাবশেষে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরছিল আর দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কালো করগেটেড টিন (প্রায় বস্তি এলাকার ছাদের জন্যে ব্যবহার করা হয়) তুলে কিছু উদ্ধার করা যায় কিনা দেখছিল।

প্রায় প্রত্যেকটি গাড়ীই হয় লোকজন নিয়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল নয় রেডক্রসের পতাকা উড়িয়ে মৃত এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল।

তারিমধ্যে হঠাৎ হঠাৎ সৈন্যদের কনভয়গুলো দেখা দিত। কনভয়গুলোতে সৈন্যরা চোখ মেলে দেখছে, হাসির লেশমাত্র নেই, বোবা, স্তব্ধ জনতার দিকে, বন্দুকের নল উঁচিয়ে ধরে।

শনিবার বিকেল চারটায় রাস্তা-ঘাট আবার খালি হয়ে গেল। সৈন্যরা আবার বেরিয়ে এলো আর নিস্তব্ধতা আবার ডানা মেলে দিলো ঢাকার উপর। কিন্তু প্রায়. সাথে সাথে আবার গুলীবর্ষণ শুরু হলো। "চারটের পর যে বের হবে তাকেই গুলী করা হবে," সেদিন আরো রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছিল।

কার্ফুর দু' মিনিট পর ইনটারকন্টিনেন্টালের সামনের রাস্তা দিয়ে একটা ছোট ছেলে দৌঁড়ে যাচ্ছিল; তাকে থামিয়ে একজন অফিসার গালে চার বার চড় কষালো তারপর জীপে করে নিয়ে গেল।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে স্থাপিত 'বার' ঢাকা ক্লাবের নৈশ পাহারাদারকে গুলী করা হয় যখন সে ক্লাবের গেট বন্ধ করতে যাচ্ছিল। একদল হিন্দু-পাকিস্তানী বাস করতো রেস কোর্সের মধ্যেকার মন্দিরে। তাদের সাবাইকে হত্যা করা হয়। মনে হয় তারা বাইরে ছিল বলেই প্রাণ হারায়।

বাস্তুত্যাগীরা ফের শহরে ফিরে আসতে লাগলো, কারণ বের হওয়ার পথগুলো সেনাবাহিনী আটকে দিয়েছিল। তারা এসে জানালো সৈন্যদের এড়িয়ে গ্রামে যাওয়ার সময় কতোজনকে হত্যা করা হয়েছে।

বহুলোক রাস্তা ছেড়ে নদী পথে রওয়ানা হয়েছিল, কিন্তু তাদের সামনে অন্য বিপদের ঝুঁকি ছিল। যখন কার্ফুর সময় হতো তখন নৌকা না পেয়ে অনেকে আটকে যেত। শনিবার বিকেলে তখন এক দল আটকে গিয়েছিল, পরদিন সকালে সেখানে শুধু রক্তের দাগ খুঁজে পাওয়া গেছে।

কোথাও শৃংখলাবদ্ধ প্রতিরোধের চিহ্ন নজরে পড়ছে না।

"ঐ সব হারামীরা" বললো একজন পাঞ্জাবী পারবে না।" "অবস্থা এখন অনেক ভালো" লেফটেন্যান্ট, "চেষ্টা করলেও আমাদের মারতে জানালো একজন অফিসার, "কেউ কথা বলতে পারছে না বা বের হতে পারছে না। আর তারা যদি তা' করে তবে তাদের হত্যা করবো—তারা অনেক বকেছে—তারা সব বিশ্বাসঘাতক; আমরা নই। আমরা আল্লাহ এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নামে যুদ্ধ করছি।"

পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের এখনও পদানত রাখতে চায়

নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা সিডনি এইচ, **শ্যানবার্গ উপরোক্ত শিরোনামে ১৯৭১ সালের ১৪ই জুলাই তাঁর পত্রিকায় লেখেন:**

এখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীর প্রায় শূন্য রাস্তায় সেনাবাহিনীর ট্রাক গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। ঐ সব ট্রাকে ভর্তি বন্দীরা। তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কঠিন শ্রম করবার জায়গাগুলোতে। তাদের মাথা কামানো, তাদের পায়ে কোন জুতো নেই, পরনে শুধু জাঙ্গিয়া, সব মিলিয়ে পালানোটা দুরূহ।

প্রতিদিন রাজধানী ঢাকার বিমান বন্দরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্লেনগুলো উড়ে আসতো। প্লেনগুলো সৈন্য ভর্তি, পরনে তাদের উপজাতীয়দের মত ঢোলা পাজামা, যাতে করে তারা সহজে ধরা না পড়ে।

বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে দমন করার অভিযানের একটি অংশ হিসেবে বাঙ্গালী মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুদের নামাংকিত রাস্তাগুলোর নাম পাল্টে দেয়া হচ্ছে। শাঁখারী বাজার এখন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্ণর ও লেফটেনান্ট জেনারেলের নামানুসারে "টিক্কা খান রোড", যাকে বাঙ্গালীরা নাম দিয়েছে "কসাই" বলে।

অসংখ্য উদহারণের মধ্যে এগুলো হলো কয়েকটি যেগুলি এই সংবাদদাতা পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক সফরের সময় দেখেছেন। পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা এই অঞ্চল তাদের দখলে রাখতে এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পদানত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পঙ্গু অর্থনীতি, সরকারী প্রশাসনের ভাঙ্গন, বাঙ্গালী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্রমবর্ধমান গেরিলা তৎপরতা, ক্রমবর্ধমান সৈনিকদের মৃত্যু এবং বিচ্ছিন্ন বিষণ্ণ জনসাধারণের নীরব প্রতিবাদ সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা অমন করছে। পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে সরকার দুটি ৭০৭ বোয়িং ভাড়া নিয়েছিল এক বছরের জন্যে কোন একটি আইরিস মালিকানাধীন বিমান সংস্থা থেকে। ঐ বিমান সংস্থার নাম 'ওয়ার্ল্ড এয়ার ওয়েজ'। বিমান দুটো ভাড়া করা হয়েছিল সত্তর হাজার থেকে আশী হাজার সৈনিক বৃদ্ধি এবং হতাহতদের স্থান পূরণের জন্যে।

প্রতিদিন সামরিক বাহিনীর আগমন ছাড়াও, কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানীদের জায়গায় কাজ করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আনছে। দায়িত্বশীল কাজের জন্যে কোন বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করা হচ্ছে না, এমন কি ঢাকা বিমান বন্দরে যে লোকটি ঘাস কাটে সেও অবাঙ্গালী।

বাঙ্গালী ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রায় নাই। তাদের চাকুরিগুলো দেয়া হয়েছে ভারত থেকে আগত অবাঙ্গালী মুসলমান বাস্তুত্যাগীদের, যেমন বিহারী, যারা নিজেদের পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে একাত্ম মনে করে। সরকারের পক্ষাবলম্বনও করছে তারা এবং খোঁজ-খবর দিয়ে সামরিক বাহিনীর বেসামরিক কাজ চালাচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলা ভাষা ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করছে এবং বাংলার পরিবর্তে নিজেদের ভাষা উর্দুকে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করছে। সৈন্যরা অবজ্ঞাভরে বাঙ্গালীদের বলে, তাদের ভাষা সভ্য জাতির ভাষা নয় এবং তারা যদি ঠিক-ঠাক মতো বেঁচে-বর্তে থাকতে চায় তবে তাদের ছেলে-মেয়েদের উর্দু সেখানো উচিত। ব্যবসায়ীরা ভয়ে তাদের বাংলা সাইনবোর্ড ইংরেজীতে পাল্টিয়ে নিচ্ছে: তারা উর্দু জানে না।

সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে, সামরিক বাহিনী নতুন এক প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনীকে ট্রেনিং দিচ্ছে যাকে সহজ কথায় বলা যায় "অনুগত" নাগরিকদের অস্ত্রে সজ্জিত করছে। এদের মধ্যে অনেকে আবার শান্তি কমিটির সদস্য। বিহারী এবং অন্যান্য অবাঙ্গালী, উর্দুভাষী মুসলমান ছাড়াও এই কমিটিতে আছে অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমান যারা বহুদিন থেকে সামরিক বাহিনী অনুরাগী ডানপন্থী ধর্মীয় দল, যেমন মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর সমর্থক।

বাংলাদেশের প্রতি অনুগত পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রাথমিক স্তরের প্রতিরোধ সংগ্রাম স্বল্পকালের মধ্যেই স্তব্ধ করা হয়। কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রাম বর্তমানে নবশক্তি সঞ্চয় করছে ভারতীয় সীমানার আশ্রয়স্থল থেকে, নতুন লোক এবং সরবরাহ নিয়ে ভিয়েতনামী কায়দায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করছে বাঙ্গালীরা এখন, যা সামরিক বাহিনীতে ক্রমবর্ধমান ত্রাসের সঞ্চার করছে।

পূর্ব পাকিস্তানের দুরাতিগম্য জায়গায় যে সব বিদেশী মিশনারীরা আছেন তাঁরাও প্রতিদিন নতুন নতুন হত্যাযজ্ঞের কাহিনী জানাচ্ছেন। জনৈক মিশনারী জানিয়েছেন, দক্ষিণে বরিশাল জেলায় সম্প্রতি সেনাবাহিনী একদিনে এক হাজার হিন্দুকে হত্যা করেছে। আরেকটি বিবরণীতে বলা হয়েছে উত্তর-পূর্বে সিলেট জেলায় একটি শান্তি কমিটি কোন এক অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার নাম করে জনসভার আহ্বান জানায়। সবাই যখন সভায় উপস্থিত হলো তখন তিনশো জন হিন্দুকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গুলি করে হত্যা করা হলো।

যখনই একজন বাঙ্গালী প্রকাশ্যে একজন বিদে-

শীর সাথে কথা বলছে তখনই ধরে নিতে হবে সে বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে। ফেরী পার হবার সময় বাঙ্গালীরা এই সংবাদদাতার গাড়ীর কাছে এসে চুপি চুপি সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতার সংবাদ দিয়েছে, অথবা মৃদু হেসে মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের অভিযানের সংবাদ জানিয়েছে।

যখনই ছ' সাত জন লোক একত্রিত হয় তখনই সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী একজন সৈন্য বা পুলিশ এসে বাঙ্গালীদের গালি-গালাজ করে ও তারাও সরে পড়ে।

সামরিক বাহিনী ও তাদের চরদের উপস্থিতি সত্ত্বেও বাঙ্গালীরা বিদেশীদের গাড়ীতে একটুকরো কাগজে 'নোট' লিখে ফেলে দিয়ে বা গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে তাদের কাহিনী শোনাবার পথ করে নিচ্ছে।

ঢাকা থেকে অনতিদূরে এক শহরে এমনি এক সাক্ষাতকারে এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন যে, তাঁকে একদিন বিনা কারণে সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায়. তাঁর টাকা-পয়সা এবং ঘড়ি কেড়ে নেয় ও অলৌকিকভাবে মুক্তি পাওয়ার আগে তাঁকে পুলিশ থানায় নিয়ে এক রাত্রির জন্যে জেলে রাখে।

ব্যবসায়ীটি জানিয়েছেন. সারা রাত তিনি প্রার্থনা করে ও দেয়ালে পূর্ববর্তী বন্দীদের লেখা পড়ে কাটিয়েছেন। লেখাগুলো, তিনি জানিয়েছেন, সব একই রকমের; নিজের নাম ও বন্দীর ঠিকানা ও তার গ্রেফতারের তারিখ দেয়া আছে এবং সাথে লেখা আছে, "আমি হয়ত নাও বাঁচতে পারি। দয়া করে আমার পরিবার-পরিজনকে বলবেন আমার ভাগ্যে কি ঘটেছিল।"

এখন পর্যন্ত তাদের একজনেরও খবর পাওয়া যায় নি, ব্যবসায়ীটি বললেন।

সেনাবাহিনী গণহত্যার সাথে সাথে ব্যাপকভাবে ধ্বংসকরণও সাধন করেছে বিষয়-সম্পত্তির। গ্রামের দিকে কখনও কখনও এক টানা মাইলের পর মাইল রাস্তার দু' পাশের গ্রামগুলোকে পুড়িয়ে মাটির সাথে সমান করে দেয়া হয়েছে। শহরের এবং নগরের বিরাট এলাকা প্রবলভাবে গুলি বর্ষণ করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে।

বাঙ্গালীরা বলছে, সেনাবাহিনী শুধু শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবে ধ্বংস করে যাচ্ছে। সেনাবাহিনী বলছে, তাদের দিকে গুলি ছোঁড়া না হলে তারা গুলি ছোঁড়ে না, কিন্তু কিছু কিছু ফিল্ড কমান্ডাররা গর্ব করে বলেন প্রায় শহরগুলোতে হয় সামান্য প্রতিরোধ ছিল, নয় ছিল প্রতিরোধহীন।

কেন এই ধ্বংসযজ্ঞ?—তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়। তাদের বাঁধাধরা জবাব, এ সব কিছু করছে, "দুষ্কৃতিকারীরা।"

যদিও অনেক বাঙ্গালী জনবহুল অঞ্চলগুলিতে ফিরে আসছেন, প্রায় শহরগুলোতে আসল জনসংখ্যার হয় অর্ধেক নয় অর্ধেকেরও কম লোক আছে এবং কিছু কিছু অঞ্চলে, যেমন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে।

অযত্নের ফলে ধানের ক্ষেতগুলোকে আগাছা ঢেকে দিচ্ছে। পাট ক্ষেতে যেখানে আগে দিনে ডজন খানেক মজুর কাছ করতো এখন সেখানে কয়েকটি নুয়ে পড়া পিঠ মাত্র নজরে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের পাট দিয়ে মজবুত থলে প্রস্তুত করা হয় এবং ঐ পাট হলো জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন ও একমাত্র প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রব্য। যে সব চিহ্ন এখন পরিস্ফুট তাতে দেখা যায় সামনের ফসল আশংকাজনকভাবে কম হবে।

আর ফসল যদি ভালোও হয় তবুও পাটের কারখানাগুলো কাজ করতে পারবে না, কেননা তাদের অধিকাংশ দক্ষ শ্রমিক পালিয়ে গেছে। তাদের উৎপাদন অত্যন্ত কম।

নদীপথে বিদ্রোহীদের তৎপরতা অব্যাহত। সেনা চলাচল বন্ধ ও উৎপাদিত পাট মিলে যাতে পৌঁছাতে না পারে তার জন্যে তারা সচেষ্ট। যশোর-খুলনা অঞ্চল বা পাটে সমৃদ্ধ, সেখানে ইতিমধ্যে তারা কয়েকটি পাটের বার্জ ডুবিয়ে দিয়েছে।

কিছু কিছু অঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি ক্রমশঃই চরম আকার ধারণ করছে এবং বিশেষজ্ঞদের মতে সামরিক বাহিনী যদি বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা আবার জোড়া লাগাতে না পারে তবে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য।

কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা বোধ হয় সম্ভব হবে না, কেননা বাঙ্গালীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ক্রমেই দুর্বার আকার ধারণ করছে। যদিও ঐ প্রতিরোধ এখনও বিশৃংখল তবুও মনে হচ্ছে ভারতের আশ্রয়, সাহায্য এবং কোন কোন সময় সহায়ক গোলাবর্ষণের সুযোগে ঐ প্রতিরোধ ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করছে।

হাজার হাজার তরুণ বাঙ্গালীকে ভারতীয় সীমানার ভিতর গেরিলা যুদ্ধ ও ধ্বংসকরণের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, ভারতীয়রা এ ব্যাপারে অনেক প্রশিক্ষক দিয়ে সাহায্য করছে। নতুন গেরিলাদের প্রথম দল এখন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসছে।

রাস্তা ও রেলসেতু এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্রগুলি উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এই সব ধ্বংসকরণের কাজে গেরিলারা সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করছে। রাস্তায় মাইন একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সদাসতর্ক সেনাবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক করার জন্যে স্থানীয় ঠিকাদারদের পাচ্ছে না: সুতরাং তারা শ্রমিকদের জোর করে ধরে এনে কাজ করাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে ফল হচ্ছে না।

কুমিল্লার বাইরে, কিছুদিন আগে গেরিলারা একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর প্রহরায় একটি মেরামতকারী ট্রেন পাঠানো হয়। গেরিলারা প্রকাশ্য দিবালোকে ঐ ট্রেন আক্রমণ করে, ফায়ারম্যানকে হত্যা করে এবং একজনকে বন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে যায়। ট্রেনটি দ্রুত শহরের দিকে ফিরে আসে।

[মূল ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ:
মুনতাসীর মামুন]

পরিশিষ্ট

স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত সাড়ে এগারটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা-যুদ্ধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

যেহেতু একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল,

এবং

যেহেতু এসব নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জন আওয়ামী লীগ সদস্যকে নির্বাচিত করেছিলেন.

এবং

যেহেতু একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণকে এক সভায় মিলিত হবার জন্য ডেকেছিলেন.

এবং

যেহেতু পরিষদের এই আহূত বৈঠক একতরফা ও বে-আইনীভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী রাখা হয়.

এবং

যেহেতু তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনারত অবস্থায় থেকেও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এক অন্যায় ও প্রতারণাপূর্ণ যুদ্ধ শুরু করে.

এবং

যেহেতু এরূপ প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারের বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় স্বাধীনতার এক ঘোষণা দান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও সংহতি রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আবেদন জানান.

এবং

যেহেতু একটি নৃশংস ও বর্বর যুদ্ধ পরিচালনায় মেতে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ অন্যান্যদের সাথে বাংলাদেশের বে-সামরিক ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর অগণিত গণহত্যা ও অভূতপূর্ব নিপীড়ন চালিয়েছে এবং এখনও চালিয়ে যাচ্ছে.

এবং

যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে এবং গণহত্যা চালিয়ে এবং দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে মিলিত হবার বা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার এবং নিজেদের একটি সরকার গঠনের কাজ অসম্ভব করে তুলেছে,

এবং

যেহেতু বীরত্ব, সাহস ও বিপ্লবী উদ্যমের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ওপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন.

যাদের ইচ্ছাই সর্বোচ্চ, বাংলাদেশের সেই জনগণের দেয়া গণ-রায় (ম্যানডেট) মেনে নিতে বাধ্য বলে আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা একটি গণপরিষদ গঠন করছি, এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা চালিয়ে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য,

বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র হিসাবে গঠন ও ঘোষণা করছি এবং এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতি অনুসমর্থন দান করছি,

এবং

সুনিশ্চিতভাবে ঘোষণা করছি ও অঙ্গীকার নিচ্ছি যে, একটি শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই থাকবেন এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইস্‌লাম থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপতি,

এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের যাবতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন।

ক্ষমামঞ্জুর করাসহ প্রজাতন্ত্রের সর্ববিধ প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নকারী ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করবেন,

তাঁর হাতে একজন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর বিবেচনানুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে,

ট্যাক্স ধার্য করার ও অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা থাকবে,

গণপরিষদ ডাকার ও ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা থাকবে,

তিনি বাংলাদেশের জনগণকে একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত সরকার দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবেন,

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আরও অঙ্গীকার করছি যে, কোন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি না থাকলে অথবা রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যভার গ্রহণে অসমর্থ হলে বা যে-কোন কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারলে রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত সমস্ত ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির ওপর বর্তাবে এবং তিনি তা প্রয়োগ করবেন,

আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে, বিশ্ব-পরিবারের সদস্য হিসাবে সকল কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন ও বাস্তবায়িত করবো এবং জাতিসঙ্ঘের সনদ মেনে চলবো,

আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, এই দলিলটি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরূপে নিয়োগ করা এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণের শপথ অনুষ্ঠানের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী

বাংলাদেশ গণপরিষদের অধীনে এবং ক্ষমতাবলে
যথাবিধি সর্বাধি ক্ষমতাধিকারী

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল এক গণসমাবেশ এ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রকাশ করা হয়।

চা বাগান

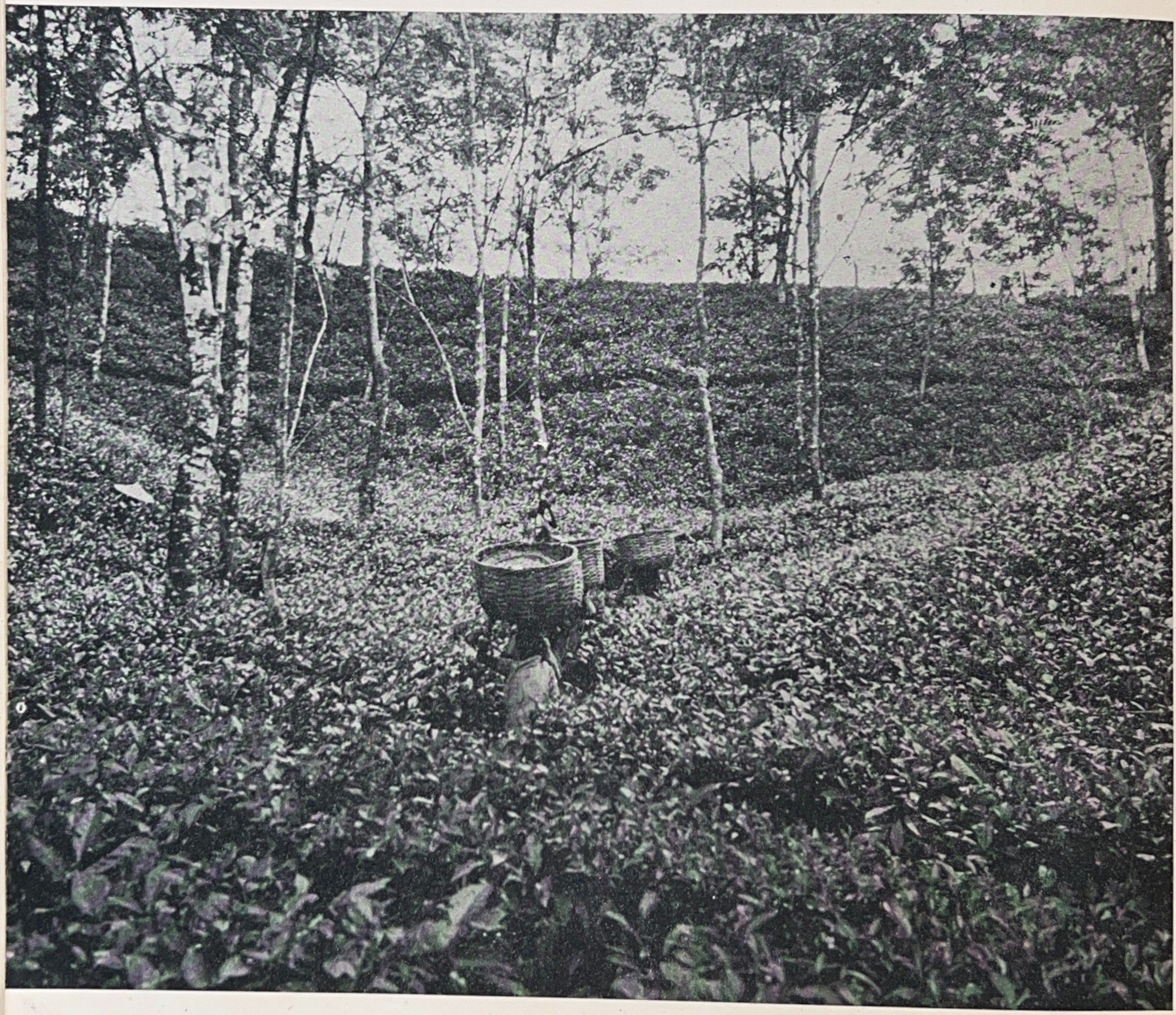

বাংলাদেশের মৌলিক পরিচয়

বাংলাদেশ অসংখ্য নদী-বিধৌত একটি নিম্ন বদ্বীপ এলাকা। এলাকাটি ২০°—৩০′ থেকে ২৬°—৩০′ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮° থেকে ৯২°—৫৬′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। তিন দিক ভারত দ্বারা বেষ্টিত বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে ভারতের মেঘালয় ও আসাম রাজ্য, পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণে ত্রিপুরা রাজ্য ও বর্মা, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর

ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশের, সীমারেখা স্থলভাগ ও সমুদ্রোপকূলসহ মোট ৩,১৬১ মাইল। এর মধ্যে ভারতের সাথে ২,৫৪২ মাইল এবং বর্মার সাথে ১৭৬ মাইল সীমান্ত অবস্থিত। ভারতের সাথে এই সুদীর্ঘ সীমান্তের অধিকাংশই নদী বা পর্বতের মতো কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত নয়।

ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশের মোট আয়তন ৫৫,১২৬ বর্গমাইল। বড় বড় নদীর জলভাগ ছাড়া এর স্থলভাগের আয়তন ৫১,৯২১ বর্গমাইল। দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কিছুটা পার্বত্য এলাকা ছাড়া বাংলাদেশ প্রধানতঃ সমতলভূমি। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এদেশকে তিনটি পৃথক ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) পার্বত্য ও নিম্ন-পাহাড়িয়া অঞ্চল; (খ) উপকূলীয় অঞ্চল; এবং (গ) নিম্ন-গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল।

পার্বত্য ও নিম্ন-পাহাড়িয়া অঞ্চলঃ ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড় এলাকা, সিলেটের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় এলাকা, কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড় এলাকা এবং চট্টগ্রামের লুসাই ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা নিয়ে উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পার্বত্য ও নিম্ন-পাহাড়িয়া অঞ্চলগুলো গঠিত। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকা বলতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া অঞ্চলকেই বুঝায়। কুকরাডং বাংলাদেশের উচ্চতম শৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই শৃঙ্গটি ৪,০৩৪ ফুট উঁচু।

উপকূলীয় অঞ্চলঃ খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা নিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বের লবণাক্ত উপকূলীয় অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলে প্রায়ই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে।

নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমিঃ বাংলাদেশের অবশিষ্ট বিস্তীর্ণ উর্বরা সমভূমি গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) ও মেঘনা নদী দ্বারা বিধৌত। বিপুল সংখ্যক নদী ও উপনদী এই বিস্তীর্ণ সমভূমি দিয়ে বয়ে গেছে। ফলে এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে বিল ও জলাভূমি। সমতলভূমির দক্ষিণাঞ্চলে তিনটি বড় নদী মিলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে। এই বদ্বীপ অঞ্চলের সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকা **সুন্দরবন** নামে পরিচিত এবং অরণ্য ও জলাভূমি দ্বারা সমৃদ্ধ।

হিমালয় থেকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বাহিত বিপুল জলরাশি এবং মৌসুমী বৃষ্টির জল এখানকার নদীগুলো ধরে রাখতে পারে না। তাই প্রায় প্রতি বছরই এদেশে ব্যাপক বন্যা হয়ে থাকে। সিলেট ও ময়মনসিংহের সমভূমির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেখানকার অসংখ্য **হাওর।** ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড় এবং ঢাকার ভাওয়াল গড়ের মতো কিছু বনাঞ্চলও এই সমভূমিতে রয়েছে। বড় নদীগুলোতে পলি জমে যাওয়ায় এই সমভূমির মধ্যাঞ্চল প্রায়ই বন্যা কবলিত হয়।

জলবায়ু

বাংলাদেশের গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল ঠান্ডা ও শুষ্ক। এখানকার জলবায়ু পুরোপুরি মৌসুমী। এদেশে ছয়টি ঋতু আছেঃ

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এগুলোর মধ্যে (১) শীত, (২) গ্রীষ্ম ও (৩) বর্ষা, এই তিনটিই প্রধান।

(১) **শীত** (কার্তিক থেকে ফাল্গুন)ঃ এ সময় আবহাওয়া মৃদু ধরনের এবং প্রধানতঃ শুষ্ক থাকে।

(২) **গ্রীষ্ম** (ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ)ঃ এ সময় ঈশানী ঝড় বয়, মোট বার্ষিক বারিপাতের শতকরা কুড়ি ভাগ এ সময়েই হয়ে থাকে।

(৩) **বর্ষা** (জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক)ঃ এ সময় বারিপাতের আধিক্য দেখা দেয় এবং আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে।

বারিপাত ও তুলনামূলক আর্দ্রতাঃ বঙ্গোপসাগরের মেঘবাহী বায়ু দেশের সর্বত্র প্রচুর বারিপাত ঘটায়। বৃষ্টি আসার আগে বা বৃষ্টিপাতের সময় প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। দেশের বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের চার ভাগের তিন ভাগই হয়ে থাকে জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে। এ সময় বৃষ্টির পরিমাণ পশ্চিমাঞ্চলে ৫০ ইঞ্চি, দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে ১০০ ইঞ্চি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২০০ ইঞ্চির মত হয়। চৈত্র-বৈশাখ ও আশ্বিন-কার্তিক মাসেও বজ্রসহ হালকা বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

সারা বছরই এখানকার জলবায়ু বেশ আর্দ্র থাকে, এমন কি শীতের মাসগুলোতেও এর ব্যতিক্রম হয় না।

তাপমাত্রা

চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের মতো গরম মাসগুলোতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭০° থেকে ৭৫°-এর মধ্যে এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৮৮° থেকে ৯৪°-এর মধ্যে ওঠানামা করে। আবার পৌষ ও মাঘের অতিরিক্ত শীতল দিনগুলোতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪৯° থেকে ৫৫°-এর মধ্যে এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৭৫° থেকে ৭৮°-এর মধ্যে ওঠানামা করে। সাধারণতঃ পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে বাড়ে ও শীতকালে কমে।

জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে বাংলাদেশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারেঃ

(ক) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল—এ অঞ্চলে আর্দ্রতা বেশী; জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত গ্রীষ্মের দিনগুলো গরম ও দীর্ঘায়িত হয় এবং এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আর কার্তিক থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত শীতের দিনগুলো মৃদু, শুষ্ক এবং সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

(খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল—এ অঞ্চলেও আর্দ্রতা বেশী, গ্রীষ্মের মাসগুলো অনেকটা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের গ্রীষ্মকালের মতো। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতের দিনগুলো শুষ্ক ও খুবই ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

(গ) পশ্চিম ও পশ্চিমের মধ্যাঞ্চল—এখানকার আর্দ্রতা মাঝামাঝি রকমের; এখানে গ্রীষ্মের মাসগুলোতে অত্যন্ত গরম এবং শীতের মাসগুলোতে তীব্র শীত অনুভূত হয়। এখানকার শীত অন্য দুটি অঞ্চলের শীতের চেয়ে তীব্রতর।

অধিবাসী

বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে মঙ্গোলীয়, তিব্বতীয়, দ্রাবিড় এবং আর্যজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। উত্তর-ময়মনসিংহ, সিলেট, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া এলাকায় গারো, হাজং, সাঁওতাল, খাসিয়া, রাজবংশী, মুরাং, খুমী, চাকমা, মগ, কুকি, বনযোগী, লুসাই, তিপরা, পাঙ্খো, ও'রাও প্রভৃতি নানারকম উপজাতি বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান, বাকী ১৫ ভাগ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান।

প্রায় সাড়ে সাত কোটি জন-অধ্যুষিত বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর অন্যতম। গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ১,৩৬১ জন লোক বাস করে। শিক্ষিতের হার শতকরা ২২ জন। জনসংখ্যার শতকরা ৫১·৪২ ভাগ পুরুষ এবং ৪৮·১৮ ভাগ নারী। অধিবাসীরা বাংলায় কথা বলে।

কৃষি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মেরুদণ্ড হচ্ছে কৃষি। শ্রমজীবী মানুষের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কৃষি নির্ভর। এখানে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ২,৩৫,৫১,৩১৫ একর। তারমধ্যে ২.২৪.২৯.৮৬৫ একর জমিতে আবাদ হয়ে থাকে। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, পাট, আখ, তামাক, চা ও তৈলবীজ প্রধান।

বন

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার একর। এই পরিমাণ মোট ভূমির শতকরা ১৬·১২ ভাগের সমান। **সুন্দরবন** এখানকার প্রধান বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলে বিশ্ববিখ্যাত 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' ও 'ডোরা হরিণ' রয়েছে। **সুন্দরবন** থেকে বছরে চার লাখ টন মূল্যবান কাঠ এবং বারো লাখ টন জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায়।

সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামেও বনাঞ্চল রয়েছে।

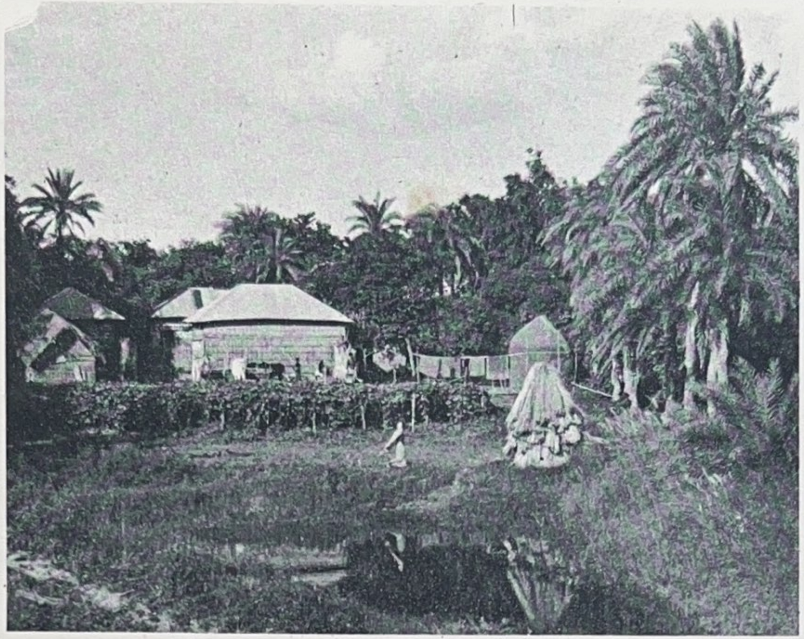

রূপসী বাংলা

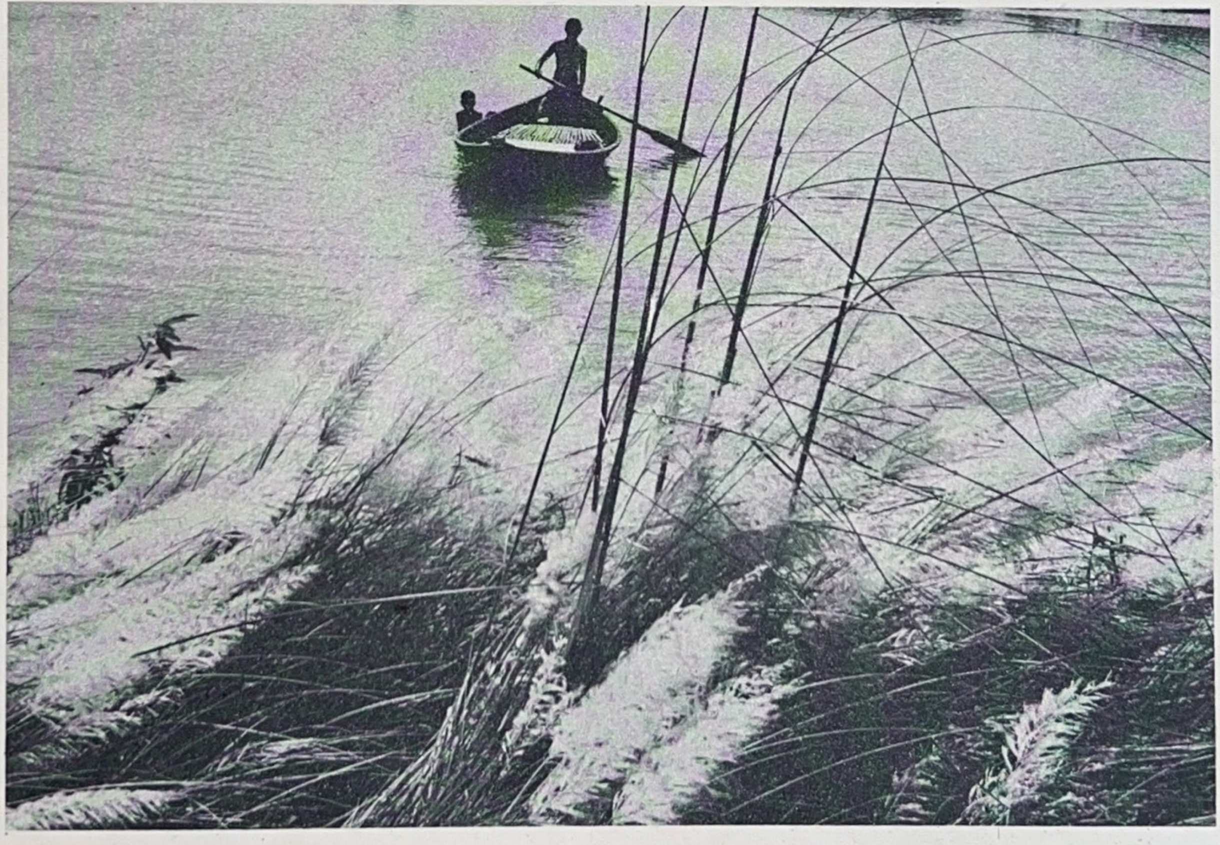

বাংলাদেশ মন্ত্রীসভা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী ... (ক) মন্ত্রিসভা সংক্রান্ত বিষয়াবলীঃ
(১) ক্যাবিনেট ডিভিশন।
(২) এষ্টাবলিশমেন্ট ডিভিশন।
(খ) প্রতিরক্ষা।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দিন আহমদ

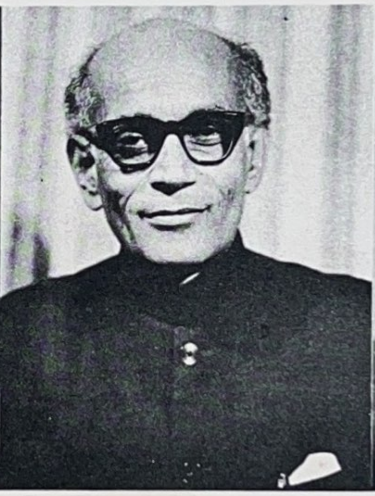
এম, মনসুর আলী

খন্দকার মুশ্‌তাক আহমদ

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ... শিল্প।

তাজউদ্দিন আহমদ ... (ক) অর্থ।
(খ) পরিকল্পনা।

এম, মনসুর আলী ... যোগাযোগ (সড়ক, জনপথ, সড়ক পরিবহণ। রেলপথ ও বন্দর)।

খন্দকার মুশ্‌তাক আহমদ ... বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ।

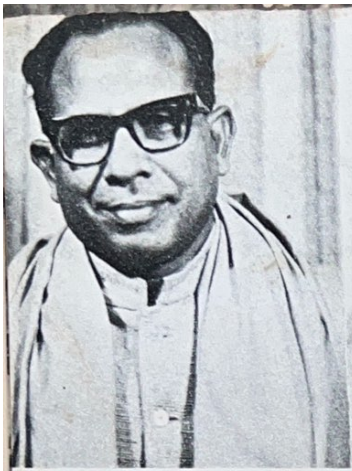
মোহাম্মদ আবদুস্ সামাদ

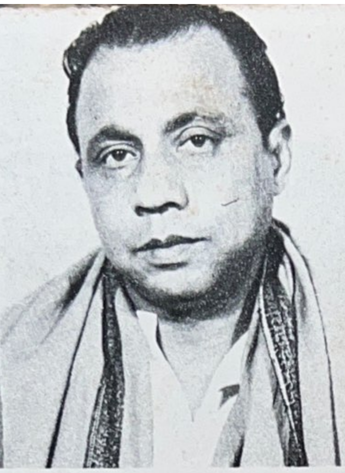
আবুল হাসানাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান

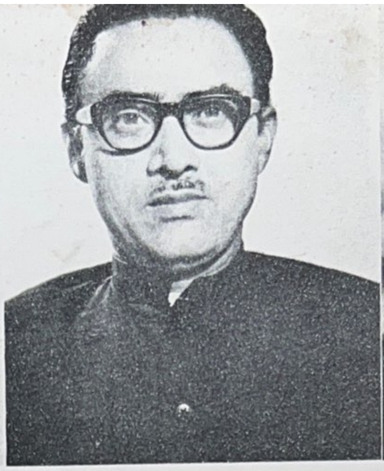
শেখ আবদুল আজিজ

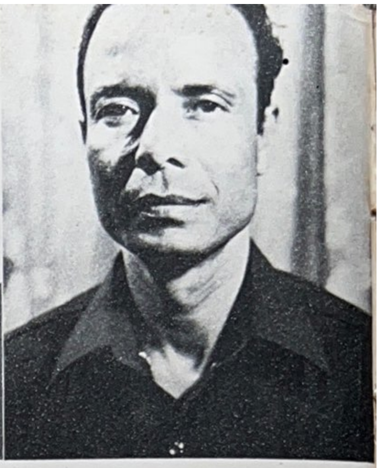
অধ্যাপক ইউসুফ আলী

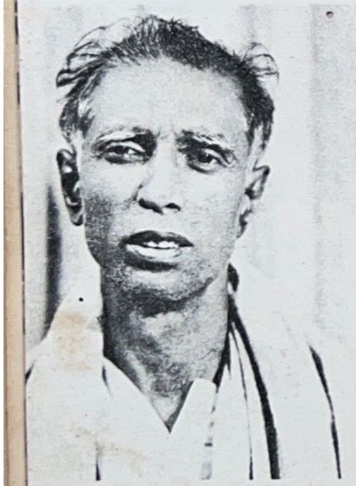
জহুর আহমদ চৌধুরী

মোহাম্মদ আবদুস্ সামাদ	...	পররাষ্ট্র।
আবুল হাসানাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান	...	সাহায্য ও পুনর্বাসন।
শেখ আবদুল আজিজ	...	কৃষি।
অধ্যাপক ইউসুফ আলী	...	শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া। (খেলা-ধুলাসহ)।
জহুর আহমদ চৌধুরী	...	(ক) শ্রম। (খ) সমাজ কল্যাণ।
শ্রী ফণী মজুমদার	...	খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ।
ডঃ কামাল হোসেন	...	(ক) আইন। (খ) পার্লামেন্টারী বিষয়।
এম, আর, সিদ্দিকী	...	বাণিজ্য।
শামসুল হক	...	(ক) স্বায়ত্তশাসন। (খ) পল্লীউন্নয়ন ও সমবায়।

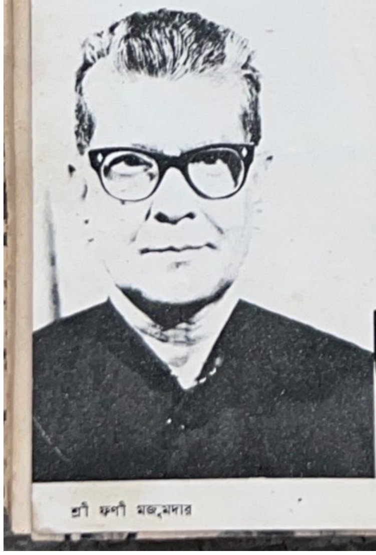
শ্রী ফণী মজুমদার

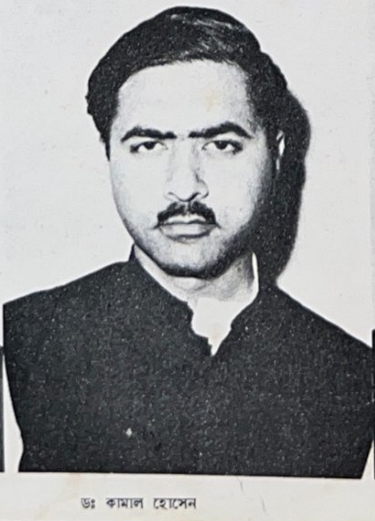
ডঃ কামাল হোসেন

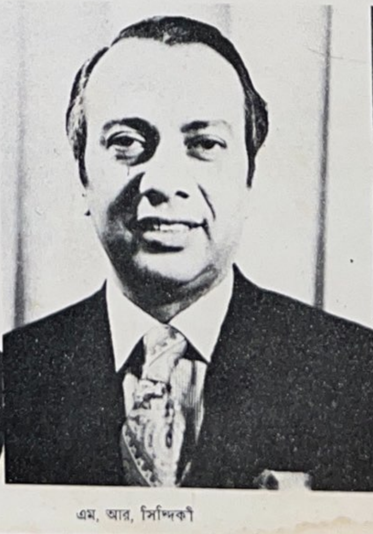
এম, আর, সিদ্দিকী

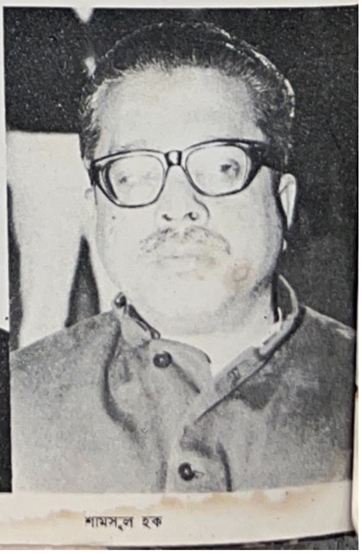
শামসুল হক

মতিউর রহমান

আবদুল মালেক উকিল

মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ

মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন

মতিউর রহমান	(ক) পূর্ত। (খ) নগর উন্নয়ন।
আবদুল মালেক উকিল	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা।
মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ	ডাক, তার ও টেলিফোন।
মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন	বন, মৎস্য ও পশু পালন।
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী	তথ্য ও বেতার।
আবদুল মান্নান	স্বরাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়াবলী।
আবদুর রব ছেরনিয়াবাত	ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার (ভূমি রাজস্ব সহ)।
জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী	জাহাজ চলাচল, আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল ও বিমান সংস্থা।
ডঃ মফিজ চৌধুরী	বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যা গবেষণা।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী

আবদুল মান্নান

আবদুর রব ছেরনিয়াবাত

জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী

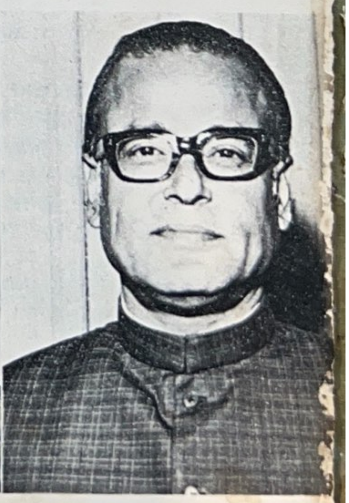

ডঃ মফিজ চৌধুরী

মোহাম্মদ আবদুস্ সামাদ

আবুল হাসানাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান

শেখ আবদুল আজিজ

অধ্যাপক ইউসুফ আলী

জহুর আহমদ চৌধুরী

মোহাম্মদ আবদুস্ সামাদ ... পররাষ্ট্র।
আবুল হাসানাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান ... সাহায্য ও পুনর্বাসন।
শেখ আবদুল আজিজ ... কৃষি।
অধ্যাপক ইউসুফ আলী ... শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া।
(খেলা-ধুলাসহ)।

জহুর আহমদ চৌধুরী ... (ক) শ্রম।
(খ) সমাজ কল্যাণ।

শ্রী ফণী মজুমদার ... খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ।

ডঃ কামাল হোসেন ... (ক) আইন।
(খ) পার্লামেন্টারী বিষয়।

এম, আর, সিদ্দিকী ... বাণিজ্য।

শামসুল হক ... (ক) স্বায়ত্তশাসন।
(খ) পল্লীউন্নয়ন ও সমবায়।

শ্রী ফণী মজুমদার

ডঃ কামাল হোসেন

এম, আর, সিদ্দিকী

শামসুল হক

মতিউর রহমান

আবদুল মালেক উকিল

মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ

মোহাম্মদ সোহ্‌রাব হোসেন

মতিউর রহমান ... (ক) পূর্ত।
(খ) নগর উন্নয়ন।

আবদুল মালেক উকিল ... স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা।
মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ ... ডাক, তার ও টেলিফোন।
মোহাম্মদ সোহ্‌রাব হোসেন ... বন, মৎস্য ও পশু পালন।
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী ... তথ্য ও বেতার।
আবদুল মান্নান ... স্বরাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়াবলী।
আবদুর রব ছেরনিয়াবাত ... ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার (ভূমি
রাজস্ব সহ)।
জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী ... জাহাজ চলাচল, আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল
ও বিমান সংস্থা।
ডঃ মফিজ চৌধুরী ... বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ, বৈজ্ঞানিক ও
কারিগরী বিদ্যা গবেষণা।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী

আবদুল মান্নান

আবদুর রব ছেরনিয়াবাত

জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী

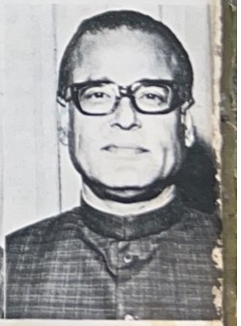
ডঃ মফিজ চৌধুরী

গ্রন্থপঞ্জী

সংকলন ও সম্পাদনাঃ

মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন

অজিত ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)ঃ ডেটলাইন বাংলাদেশ। জয়কো পাবলিশিং হাউস, বম্বে, ১৯৭১

অ্যান অ্যামেরিকান রিস্পন্স টু পাকিস্তান ক্রাইসিস। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ১০, ১৯৭৯ (পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির ওপর তাঁর ধারণা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্স্ এ মিঃ কর্ণেলিয়াস ই, গ্যালাঘারের বিবৃতি)

আর্থড দ্রেফাস পলঃ দু পাকিস্তান অ বাংলাদেশ, ফ্রান্স (পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ)

আলফ্রেড আবদুল মুখার্জীঃ বাংলার রংগলাল। সাহিত্য, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কোলকাতা—১২

আনোয়ার আহ্মদঃ বায়ান্ন থেকে বাহাত্তর। ছাত্র শিক্ষা নিকেতন, ২ বঙ্কিম ষ্ট্রীট, কোলকাতা—১২

আর, কে, দাশগুপ্তঃ রিভল্ট ইন ইষ্ট বেঙ্গল। দিল্লী, এ, দাশগুপ্ত, ১৯৭১

আব্দুল জাব্বারঃ বাংলার মানচিত্র। মিত্র এন্ড ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কোলকাতা—১২

ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বাংলাদেশ (স্মারকগ্রন্থ)। নয়াদিল্লী, রাধাকৃষ্ণ, ১৯৭১ (১৯৭১ সনের ১৮, ১৯ ও ২০শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়)

ইন্দুভূষণ দাশঃ জয় বাংলা জয় মুক্তিফৌজ। মৌসুমী সাহিত্য মন্দির, ১৫-বি, তামার লেন, কোলকাতা—৯

ই. এস, মেসন এবং অন্যান্যঃ কনফ্লিক্ট ইন ইষ্ট পাকিস্তানঃ ব্যাকগ্রাউন্ড এন্ড প্রসপেক্টস। মুজিবনগর, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭১

এন্থনী মাসকারেনাসঃ রেপ অব বাংলাদেশ। দিল্লী। ভীকাস পাবলিকেশনস্, ১৯৭১

এডওয়ার্ড ম্যাসন, রবার্ট ডর্ফম্যান, ষ্টিফেন এ, মার্গলিনঃ কনফ্লিক্ট ইন ইষ্ট পাকিস্তান (দি হেরাল্ড ইকনমিষ্টস)

কমল রায় চৌধুরীঃ বাংলাদেশের হৃদয় হতে

কামালউদ্দীন আহ্মদঃ বাংলাদেশ —উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশনস, ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা—৯

কামালউদ্দীনঃ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশনস্, ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা—৯

কৃষ্ণ ধরঃ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ। শংকর প্রকাশন, ১৫/১-এ, তুগল কিশোর দাস লেন, কোলকাতা—৬

গিরিলাল জৈনঃ পাকিস্তান মিলিটারী এলিটঃ নাজীষ্টাইল জেনোসাইড ইন ইষ্ট বেঙ্গল। দিল্লী, গিরিলাল জৈন, ১৯৭১

জগ মোহন (সংকলিত ও সম্পাদিত)ঃ দি ব্ল্যাক বুক অব জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ। একটি প্রামাণ্য বই। নয়াদিল্লী, গীতা বুক সেন্টার, ১৯৭১

জয় বাংলার মুক্তিযুদ্ধঃ বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস। ৫/১, কলেজ রো, কোলকাতা

জে, পি, মিত্তিরঃ রিকগনিশন অব বাংলাদেশ। কোলকাতা, পি, বি, হাজরা গুপ্ত প্রেস, ১৯৭১

টেরর এন্ড ব্রুটালিটি ইন বাংলাদেশঃ বাংলাদেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭১

ডম-মোরেসঃ দি টেম্পেষ্ট উইদিনঃ অ্যান একাউন্ট অব ইষ্ট পাকিস্তান। দিল্লী, ভীকাস্ পাবলিকেশনস, ১৯৭১

ডি, আর, মনকেকারঃ কলোনিয়েলিজম ইন ইষ্ট বেঙ্গল। বম্বে, সুমাইয়া পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিঃ ১৯৭১

ডি, কে, পালিত (মেজর জেনারেল)ঃ লাইট্নিং ক্যাম্পেন। দি ইন্ডো-পাক ওয়ার, ১৯৭১। নিউদিল্লী থম্পসন প্রেস (ইন্ডিয়া)

ডেভিড লোশাকঃ পাকিস্তান ক্রাইসিস। লন্ডন, হাইনমান, ১৯৭১

তারিক আলীঃ পাকিস্তানঃ মিলিটারী রুল—এ পীপলস পাওয়ার। ভীকাস পাবলিকেশনস, দিল্লী,

থাউজ্যান্ড মাই লাইসঃ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট

হোয়াই বাংলাদেশঃ বাংলাদেশ মিশন, কোলকাতা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭১

দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীঃ ইষ্ট পাকিস্তানঃ এ কেস ষ্টাডি ইন মুসলিম পলিটিকস। ভিকাস পাবলিকেশনস, দিল্লী

দি ট্রুথ এবাউট বাংলাদেশঃ বাংলাদেশ মিশন, কোলকাতা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭১

নচিকেতা গৌতমঃ ট্রেটরস অব পাকিস্তান। নয়াদিল্লী, দি প্রেস এন্ড পাবলিশিং এজেন্সী, ১৯৭১

নরেন্দ্র গয়েলঃ উইপনস্ ভার্সাস মেন। নয়াদিল্লী, অগ্নিপথ পাবলিকেশন, ১৯৭১

প্রফেসর হাসান মুর্শেদঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা—৭

প্রবোধ চন্দ্রঃ ব্লাডবাথ ইন বাংলাদেশ। নয়াদিল্লী, আদর্শ পাবলিকেশনস, ১৯৭১

প্রীতিশ নন্দীঃ বাংলাদেশ, এ ভয়েস অব এ নিউ ন্যাশন। ডায়লগ পাবলিকেশনস, কোলকাতা, ১৯৭১

প্রাণ চোপরা (সম্পাদিত)ঃ দি চ্যালেঞ্জ অব বাংলাদেশঃ একটি বিশেষ বিতর্ক। বম্বে, পপুলার প্রকাশনী, ১৯৭০

ফজলুল কাদের কোরেশীঃ বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস। বেগম দিল আফরোজ চৌধুরী (সম্পাদিকা), ১৩২, গ্রীন রোড, ঢাকা—২

বঙ্গবন্ধু স্পীকসঃ বৈদেশিক প্রচার বিভাগ, পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্লাডবাথ ইন বাংলাদেশঃ যুক্তরাজ্যের প্রেস-মন্তব্যসমূহ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭১

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবুর রহমানের বাছাই করা বক্তৃতা ও বিবৃতি—রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, নয়াদিল্লী—১

বাংলাদেশ ডকুমেন্টসঃ ভারতীয় বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ—ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড পারসপেক্টিভসঃ ভল্লা বুকসার্ভিস, এস-৬১ গ্রেটার কৈলাস, নয়াদিল্লী—৪৮

বাংলাদেশ—এ রিয়্যালিটি। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশ—কন্টেম্পোরারী ইভেন্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টসঃ বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক প্রচার বিভাগ

বাংলাদেশঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গণসংযোগ বিভাগ

বাংলাদেশ স্পীকসঃ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি- নয়াদিল্লী ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি, ১৯৭১

বাংলা নামে দেশঃ অভীক সরকার সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা

বেনেদীত কোষ্টাঃ ডিসমেম্বারমেন্ট অব পাকিস্তান। ইলাষ্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া ভল্লা বুক সার্ভিস

মেসবাহ আহ্‌মদঃ বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আইয়ুব এন্ড আদার্সঃ বাংলাদেশঃ ষ্ট্রাগল ফর ন্যাশনহুড। ভিকাস পাবলিকেশনস, দিল্লী, ১৯৭১

মোসে ক্লদঃ মোরি পো' ঢাকা ফ্রান্স (ডেথ টু ঢাকা)

যমুনা দাস আখতারঃ দি সাগা অব বাংলাদেশ। দিল্লী ওরিয়েন্টাল পাবলিশার্স, ১৯৭১

যতীন্দ্র ভাটনাগরঃ বাংলাদেশঃ বার্থ অব এ নেশন, ইন্ডিয়ান স্কুল সাপ্লাই রিপোর্ট, দিল্লী, ১৯৭১

রঞ্জিত গুপ্ত/রাধাকৃষ্ণ (সম্পাদিত)ঃ ওয়ার্লড মীট অন বাংলাদেশ। ভারত থেকে প্রকাশিত

রিচার্ড এন্ড হেলেন (সম্পাদিত)ঃ দি টেষ্টিমনি অব সিক্সটী, অক্সফাম, বারবারী রোড, অক্সফোর্ড

লীডারস্ অব বাংলাদেশ স্পীকঃ বাংলাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭১ (বাংলাদেশের বিষয় বর্ণনা করে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং মাওলানা ভাসানীর প্রেস-বিবৃতি এবং বেতার ভাষণ

বি, এন, মেহরিশঃ ওয়ার ক্রাইসিস এন্ড জেনোসাইড—দি ট্রায়াল অব পাকিস্তান ওয়ার ক্রিমিন্যালস। ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স, দিল্লী—৬, ১৯৭২

শ্যামল বসুঃ প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বাংলাদেশ। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশনস, ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা—৯

সুবাস চন্দ্র কস্যপ (সম্পাদিত)ঃ বাংলাদেশঃ ব্যাকগ্রাউন্ড পারস্পেক্টিভস্ দিল্লী, ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ১৯৭১ (সাংবিধানিক এবং সংসদীয় শিক্ষা ইনসটিটিউট প্রকাশিত)

সুবিমল কুমার মুখার্জীঃ বাংলা দেশ এন্ড ইন্টারন্যাশন্যাল ল' কোলকাতা। বি, ভট্টাচার্য ১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারতঃ বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫/১-এ, কলেজ রোড, কোলকাতা—৯

হার্বার্ট ফিল্ডম্যানঃ রিভল্যুশন ইন পাকিস্তান। লণ্ডন, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস

হোয়াইট বুক অন বাংলাদেশঃ বিশ্ব শান্তি পরিষদের তথ্য কেন্দ্র, হেলসিংকী, ফিনল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত

সাধারণ

অশোক ভি, দেশাইঃ ইকনমিক ইফেক্টস্ অব দি ওয়ার। হিন্দুস্তান টাইমসঃ ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১

অশোক ভি, দেশাইঃ কেস ফর বাংলা ন্যাশনালিজ্ম। ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলী ৬(২১)ঃ ২১ মে, ১৯৭১ ১০৩৫—১০৩৯

অনিরুদ্ধ গুহঃ বাংলাদেশ—পারসপেক্টিভ এণ্ড প্রসপেক্টস। 'নীতি' ২(১)ঃ ৮ এপ্রিল, জুন, ১৯৭১ঃ ১০-১৫

অশোক মেহতাঃ দি প্রায়োরিটীস্ ইন বাংলাদেশ। 'ষ্টেটস্ম্যান' ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অর্জুন সেনগুপ্তঃ ইকনমিক রিকনষ্ট্রাকশন অব বাংলাদেশ ইমেডিয়েট পারসপেক্টিভ্। 'মেনষ্ট্রীম' ১০(১৭)ঃ ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ঃ ১৫-১৮

অরুণ চন্দ্র গুহঃ বাংলাদেশ প্রব্লেমস এণ্ড পাওয়ার পলিটিক্স। অমৃতবাজার পত্রিকাঃ ২০ অক্টোবর, ১৯৭১

অমলেন্দু নাগঃ বাংলাদেশ ডিভাইডস কম্যুনিষ্টস। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস ; ৪ আগষ্ট ১৯৭১

অরুণ বাগচীঃ বাংলাদেশ এণ্ড দি ইণ্ডিয়ান রেপনস। হিন্দুস্তান ষ্ট্যাণ্ডার্ডঃ ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অশোক মেহ্তাঃ ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ—এ র‍্যায়ার মোমেণ্ট ইন হিষ্ট্রী। ষ্টেটসম্যান, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অমৃত সিংঃ টুওয়ার্ডস কো-এক্সিটেন্স। হিন্দুস্তান টাইমস, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অমলেন্দু দাসগুপ্তঃ চায়না অন বাংলাদেশ—কণ্ট্রাডিকশন্স এণ্ড ক্যালকুলেশন্স। ষ্টেটস্ম্যান, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

আসগর আলীঃ বাংলাদেশ এণ্ড মুসলিম ওয়ার্ল্ড। য়ুনাইটেড এশিয়াঃ ২৩(৩)ঃ মে-জুন, ১৯৭১। ১৯২-১৯৬

আর. কে. দাশগুপ্তঃ রিভল্ট ইন ইষ্ট বেঙ্গল। কোলকাতা ১৯৭১, পৃষ্ঠা ১৩৪

আহমদ রশীদ শেরওয়ানীঃ বাংলাদেশ—লেসন্স ফর ইণ্ডিয়ান মুসলিমস। প্যাট্রিয়টঃ ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১

ইন্দ্র মালহোত্রঃ এ ব্লুপ্রিণ্ট ফর বাংলাদেশ—আর্জেণ্ট টাস্কস্ এহেড। টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ইন্দ্র সেনঃ ইয়েস্, বাংলাদেশ ইজ ইকনমিক্যালি ভায়্যাব্ল্। হিন্দুস্তান ষ্টাণ্ডার্ড, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড য়্যাফেয়ার্সঃ হাউ পাকিস্তান ভায়োলেটেড হ্যুম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ—সাম টেষ্টিমনিয়েল্স। আই. সি, ডব্লু, এঃ নয়াদিল্লী, ১৯৭২ পৃষ্ঠা ৬২

ই, হাবিবুল্লাহঃ বাংলাদেশ—ইট্স ইম্পেক্ট অন পাওয়ার ইকোয়্যাশন। প্যাট্রিয়ট, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

উইলিয়াম এস, এলিসঃ বাংলাদেশঃ হোপ্ নারিশেস এ নিউ নেশন

ন্যাশনাল জ্যুগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন। ওয়াশিংটন ডি, সি, সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

এন, এম, কে,ঃ বাংলাদেশ—এ ষ্টাডি ইন দি ডিনামিক্স্ অব ন্যাশনালিজম

য়ুনাইটেড এশিয়াঃ ২৩(৩)ঃ মে-জুন, ১৯৭১ঃ ১৪৯-১৫২

এ, কে, রায়ঃ ন্যাশনাল এণ্ড কম্যুনিষ্ট ফোর্সেস অ্যাট্ ক্রস-রোড্স্ ইন বাংলাদেশ। য়ুনাইটেড এশিয়া; ২৩(৩)ঃ মে-জুন ১৯৭১: ১৬৪-১৭১

এম, এম, শাঁখদারঃ ওয়ান্টেড পলিটিক্যাল ইন্জিনীয়ারিং—ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান এণ্ড বাংলা দেশ। মাদারল্যান্ডঃ ৮ জুলাই, ১৯৭১

এল, এম, সিংভীঃ ট্রায়্যাল অ্যাট্ দি বার অব হ্যুম্যানিটি। হিন্দুস্তান টাইম্স্ (রবিবাসরীয় সংখ্যা) ; ৯ জানুয়ারী, ১৯৭২

এল, এন, তেওয়ারী (সম্পাদিত)ঃ ওয়ার্ড অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইন বাংলাদেশ—এ ডকুমেণ্টারী ষ্টাডি। নবচেতনা, বারানসী, ১৯৭১ পৃষ্ঠা ১৮০।

এ, য়ুহাঁসিঃ কনসিকোয়েন্সেস অব দি পাকিস্তান ক্রাইসিস। নিউ টাইমস, জুন, ১৯৭১

এ, য়ুহাঁসিঃ থ্রেট টু পীস অন দি ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। নিউ টাইমস, ডিসেম্বর, ১৯৭১

এস, আলী জহীরঃ হোয়াট ইজ য়্যাট ষ্টেক ইন বাংলাদেশ? ন্যাশনাল হেরাল্ড, ৫ জুলাই, ১৯৭১

এম, সি, মুখার্জীঃ ফাইটিং ইন বাংলাদেশ এণ্ড প্রসপেক্টস অব ইণ্ডিয়ান জুট। ষ্টেটসম্যান, ২৮ জুলাই ১৯৭১

এস, বেনুঃ ইষ্ট বেঙ্গল, দি এগোনী অব এক্সপ্লয়টেশন। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস। ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১

এস, ই, হাসনাইনঃ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস এণ্ড বাংলাদেশ। ফ্রী প্রেস জার্নাল, ১৭ জুন, ১৯৭১

এস, বিশ্বম্‌ঃ গেন্‌স্‌ ফ্রম দি ওয়ার। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান। ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

এস, বিশ্বম্‌ঃ এ নিউ সীজ-ফায়ার লাইন? ষ্টেট্‌স্‌ম্যান। ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

এস, বিশ্বম্‌ঃ ইণ্ডিয়া'স কমিটমেণ্টস টু বাংলাদেশ। ষ্টেটসম্যান। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

এস, এ, দান্‌জ্‌ঃ নিউ টাস্কস্‌ বিফোর বাংলাদেশ এণ্ড আওয়ার রোল। প্যাট্রিয়ট, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

এ, জি, নুরানীঃ ইণ্ডিয়া'স পলিসী অন বাংলাদেশ। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস। ১৯ জুলাই, ১৯৭১

এ, সি, এন, নম্বিয়ারঃ হাউ ইউরোপ লুক্‌স অ্যাট বাংলাদেশ। হিন্দুস্তান ষ্টাণ্ডার্ড। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

এস, নিহাল সিংঃ বাংলাদেশ এণ্ড দি ওয়েষ্ট—বেটার আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং অব ইণ্ডিয়ান অ্যাপ্রোচ্‌। ষ্টেটসম্যান। ২০ নভেম্বর, ১৯৭১

এন, এস, গেলটঃ ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান এণ্ড বাংলাদেশ। ন্যাশনাল হেরাল্ড। ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১

কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়াঃ কেস ফর বাংলাদেশ। কম্যুনিষ্ট পার্টি, নয়াদিল্লী, ১৯৭১। পৃষ্ঠা ১৪৬

কামাল এ, ফারুকীঃ ইণ্ডিয়া'স রোল ইন দি ইষ্ট পাকিস্তান ক্রাইসিস—লিগাল অ্যাসপেক্টস। রিভ্যু অব ইণ্টারন্যাশনাল য়্যাফেয়ার্স, ২২ (৫১৬): ৫ অক্টোবর, ১৯৭১: ২৪-২৮

করণ সিংঃ দি ওয়ার—আইডিয়োলজিক্যাল পারসপেক্টিভস। ন্যাশনাল হেরাল্ড, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কুলদীপ নায়ারঃ হিন্দু'স ইন বাংলাদেশ—ইসলামাবাদ'স পলিসি। ষ্টেটসম্যান, ২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

কে, রঙ্গস্বামীঃ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট বাংলাদেশ। আসাম ট্রিব্যুন, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কে, সুব্রামানিয়ামঃ ফ্রী বাংলা স্পীল্‌স পীস্‌, প্রগ্রেস। ফ্রী প্রেস জার্নাল। ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কে, সি, খান্নাঃ রীবিল্‌ডিং বাংলাদেশ—চ্যালেঞ্জেস এন্ড অপরচুনিটীস। টাইমস অব ইন্ডিয়া। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কে, ভি, মুখার্জীঃ ইকনমিক রিকনষ্ট্রাকশন অব বাংলাদেশ। অমৃতবাজার পত্রিকা। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কে, পি, করুণাকরণঃ দি রিভল্ট ইন পাকিস্তান এন্ড দি পলিটিক্‌স অব ইন্ডিয়ান সাবকণ্টিনেণ্ট। রিভ্যু অব ইণ্টারন্যাশনাল য়্যাফেয়ার্সঃ ২২(৫১৪): ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১: ১৪-১৬

কে, রঙ্গস্বামীঃ ইন্ডিয়ান পার্টীস্‌ এন্ড বাংলাদেশ। মাদারল্যান্ড। ২১ জুলাই, ১৯৭১

কে, আর, মালকণীঃ পার্টিশন উইল ডু পাকিস্তান গুড্‌। মাদারল্যান্ড। ১৯ মে, ১৯৭১

গোপাল কৃষ্ণঃ ইন্ডিয়া এন্ড বাংলাদেশ। ইকনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলী। ৬(৩৩): ১৪ আগষ্ট, ১৯৭১: ১৭৪৯-১৭৫১

গিরিলাল জৈনঃ স্যাকিং দি পাক জেনারেল্‌স্‌—মিঃ ভুট্টো'স বিড টু কনসলিডেট পাওয়ার। টাইমস অব ইন্ডিয়া। ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

গিরিলাল জৈনঃ ভে'ন কোয়েষ্ট ফর লুজ লিংক্‌স—মিঃ ভুট্টো'স টকস উইথ শেখ মুজিব। টাইমস অব ইন্ডিয়া। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

গিরিলাল জৈনঃ অ্যামেরিকা'স নিউ এশিয়া পলিসি—অ্যাজ দি ওল্ড। টাইমস অব ইন্ডিয়া। ১২ জানুয়ারী, ১৯৭২

গিরিলাল জৈনঃ ডিফ্যুজিং দি ক্রাইসিস—ইল কনসিডার্‌ড্‌ ওয়েষ্টার্ন মুভ্‌। টাইমস অব ইণ্ডিয়া। ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

গিরিলাল জৈনঃ প্যারালাল সিনো-ইউ, এস, পলিসীস—সাপোর্ট ফর মিলিটারী রেজিম ইন পাকিস্তান। টাইমস অব ইন্ডিয়া। ১৪ জুলাই, ১৯৭১

গিরিলাল জৈনঃ দি ইউ, এস, টেলস এ ফলী-টেল—হোয়েন ইটস ক্যালকুলেশনস ওয়েণ্ট অরী। টাইমস অব ইন্ডিয়া। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

গিরীজা মুখার্জীঃ ইণ্ডিয়া'স পার্টিশন এণ্ড বাংলাদেশ। ইউনাইটেড এশিয়া। মে-জুন, ১৯৭১

গুনদা মজুমদারঃ বাংলাদেশ—রিকগনিশন এন্ড আফটার। অমৃত বাজার পত্রিকা। ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

চৈতন্যঃ নিউ ডায়মেনশনস অব পলিসী অব বাংলাদেশ—রিয়েল টেস্ট অব নন-অ্যালায়নমেণ্ট। লিঙ্ক। ১৫ আগষ্ট, ১৯৭১। ৬৫-৬৭

জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ—এ কম্পাইলেশন অব ওয়ার্ল্ড প্রেস রিপোর্ট। গান্ধীয়ান ইনষ্টিটুট। ১৯৭১

জন গ্রিগঃ ভিউজ অন বাংলাদেশ। লিস্‌নার-৮৬(২২০৯): ২৯ জুলাই, ১৯৭১। ১৩৪ট্র১৩৫

জে, বি, কৃপালনীঃ ন্যাশনাল ইনটারেষ্ট এণ্ড বাংলাদেশ। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। ২৯ অক্টোবর, ১৯৭১

জন ওসমানঃ কন্‌ফিডেন্ট ইন্ডিয়া। লিসনার-৮৬(২২২৯): ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ৮৩১—৮৩২

জয় সাভারকরঃ ইকনমিক চ্যালেঞ্জ ফেসিং বাংলাদেশ। ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভ্যু। ৭৪(৫১); ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ১২-১৩

জয় প্রকাশ নারায়ণঃ বাংলাদেশ এণ্ড ইণ্ডিয়া'স ফিউচার। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৭-২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

জয়ন্ত কুমার রায়ঃ পার্টনারস ইন জেনোসাইড। মেনষ্ট্রীমঃ ৯(৪৮)ঃ ৩১ জুলাই, ১৯৭১

জর্জ ফারনাণ্ডিসঃ দি গভর্ণমেণ্ট পলিসী অন বাংলাদেশ ইন রিট্রোস্‌পেক্ট। পয়েণ্ট অব ভিউ। ২(৪০), ত্বড়ু ডিসেম্বর, ১৯৭১

জগদীশ ভগবতী ও পদ্মা দেশাইঃ ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, ইউ-এস এণ্ড বাংলাদেশ। ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলী। ৬(৩৩): ১৪ আগষ্ট, ১৯৭১। ১৭৫১, ১৭৫২, ১৭৫৪

টি, জে, এস, জর্জঃ দি ক্রস অব বেঙ্গল—ডিসপ্যারিটীস বিটুইন ইষ্ট এন্ড ওয়েষ্ট পাকিস্তান (উইথ ফিগার্‌স)। ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভ্যু। ৭২(১৭)। ২৪ এপ্রিল, ১৯৭১। ৫৭-৬৩

টি, ভি, জয়রামনঃ ইণ্ডিয়া, বাংলা দেশ এণ্ড সাউথ-ইষ্ট এশিয়া। য়ুনাইটেড এশিয়া ২৩(২); মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭১, ৬৯-৭২

টি, বি, লাহিড়ীঃ বাংলাদেশ এণ্ড ইণ্ডিয়া—এরিয়াস অব কো-অপারেশন। অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ডি, এন, ব্যানার্জীঃ ইষ্ট পাকিস্তান—কেস ষ্টাডী অন মুসলিম পলিটিকস্‌। ভীকাস পাবলিকেশনস, নয়াদিল্লী। ১৯৭১

দীনেশ সিংঃ দি ডেথ অব জিন্নাহ'স্‌ পাকিস্তান। ষ্টেটসম্যান (রবিবাসরীয়)। ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দিঙ্কর সর্কারকারঃ ফ্রী বাংলাদেশ—ফোর্স ফর প্রগ্রেসিভ এণ্ড সেক্যুলার ডেমোক্র্যাসী। য়ুনাইটেড এশিয়া। ২৩(৩); মে-জুন, ১৯৭১

দিবাকর ঝাঃ ইকনমিকস অব বাংলাদেশ। সার্চ লাইট। ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

দিলীপ মুখার্জীঃ শ্যাডোস ওভার বাংলাদেশ—ইকনমিক ইম্‌প্যাক্ট অব সিভিল ওয়ার। টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ১২ এপ্রিল, ১৯৭২

দিলীপ মুখার্জীঃ নিউ দিল্লী এণ্ড ঢাকা—ওয়াইপিঙ আউট দি স্লেট ক্লীন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ১২ জানুয়ারী, ১৯৭২

নফিস আহমদঃ বাংলাদেশ এণ্ড ইণ্ডিয়ান মুসলিম্‌স্‌। মেনষ্ট্রীম। ৯(৮৬), ১৭ জুলাই, ১৯৭১। ১৬—১৭

পঞ্চানন মিশ্রঃ বাংলাদেশ এণ্ড ওয়ার্ল্ড পাওয়ার্স। ন্যাশনাল হেরাল্ড। ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রভাকরঃ কম্পোজিট কালচারাল হেরিটেজ। আসাম ট্রিব্যুন। ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রেম শংকর ঝাঃ নিউ ইকনমিক প্রায়োরিটীস–ষ্ট্রাটেজী ফর সেল্‌ফ রিলায়েন্স। টাইমস অব ইণ্ডিয়া। ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পেরালা রত্নম্‌ঃ পারসপেক্টিভ প্লান ফর বাংলা–ভাইটাল ফ্রী প্রেস জার্নাল। ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পিটার আলভার্‌স্‌ঃ দি ওয়ার এণ্ড ইটস অবজেক্টিভস। জনতা। ২৬(৪৯), ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রদীপ বোসঃ য়ুনাইটেড বেঙ্গল–পেরিলস এণ্ড প্রসপেক্টস্‌। জনতা ২৬(২২), ২০ জুন, ১৯৭১। ১৫-২০

পি, এন, লুতরাঃ প্রব্লেম অব রিফ্যুজীস ফ্রম ইষ্ট বেঙ্গল। ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলী ৬(৫০) ডিসেম্বর, ১৯৭১। ২৪৬৭, ২৪৬৯, ২৪৭১, ২৪৭২

পরেশ দাসগুপ্তঃ বাংলাদেশ—নিক্সন'স ব্লাইণ্ড্‌ স্পট। অমৃত বাজার পত্রিকা। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ–ফ্রম অটোনমি টু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স–এ ওয়ার্ল্ড কমেনট্রী। বাংলাদেশ মিশন, দিল্লী, ১৯৭১

বাংলাদেশ–এ ন্যাশন ইন দি মেকিং ফর টুয়েন্টি ফাইভ ইয়ারস্‌। সেমিনার (১৪২), জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ওয়ার্ল্ডঃ মার্কসিষ্ট রিভ্যু। মে, ১৯৭১। ৪৪৬-৫৬১

বাংলাদেশ–ডিসপ্যারিটি বিটুইন ইষ্ট এন্ড ওয়েষ্ট পাকিস্তান। নিউ রিপাবলিক। ১৬৪(১৬); ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশ—সীলোন্‌স্‌ ডিলেমা। হিন্দু; ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ এন্ড ফ্যুচার অব সাবকন্টিনেন্ট। ন্যাশনাল হেরাল্ড। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ব্লীডিং বাংলাদেশ–ক্রাইম অ্যাগেনষ্ট হ্যুম্যানিটি। সাগর পাবলিকেশনস, নয়াদিল্লী, ১৯৭১

বিপিন পাল দাসঃ দি রিভল্ট অব বাংলাদেশ—ইট্‌স্‌ সিগনিফিকেন্স এন্ড ইমপ্লিকেশন্‌স্‌। আসাম ট্রিব্যুন। ২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

বি, জি, ভারগীজঃ ইষ্টার্ণ ট্রান্সফর্মেশন–দি এক্সসাইটিং প্রমিজ অব কো-অপারেশন। হিন্দুস্তান টাইমস (রবিবাসরীয়)। ২ জানুয়ারী, ১৯৭২

বি, জি, ভারগীজঃ গ'ন আপ্‌ ইন স্মোক—দি সীজফায়ার লাইন ইন জম্মু এন্ড কাশ্মীর। হিন্দুস্তান টাইমস। ১৬ জানুয়ারী, ১৯৭২

ভি, আর, কৃষ্ণ আয়ারঃ সোনার

বাংলা—এ ষ্টারড্ কোশ্চেন। ন্যাশনাল হেরাল্ড। ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ভি. এস. কোশীঃ ইউ এস অ্যাটিচ্যুড টুয়ার্ডস বাংলাদেশ। মেনষ্ট্রীম। ৬ নভেম্বর, ১৯৭১

মুহম্মদ আসিফ আনসারীঃ জেনোসাইড এণ্ড ওয়ার ক্রাইমস্ ইন বাংলাদেশ—প্রসেজুয়র ফর ট্রায়াল। ন্যাশনাল হেরাল্ড। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মুহম্মদ আমজাদ হোসেনঃ বার্থ অব এ নিউ নেশন। দি পীপ্‌ল্। (ঢাকা), মার্চ ২৬, ১৯৭২

মাইকেল হর্ন্‌স্‌বিঃ হিষ্ট্রিক্যাল হ্যাট্রেড বিটুইন দি রায়ভ্যাল হিন্দু এণ্ড মুসলিম কম্যুনিটীস-সেল্‌ফ্ ডিফীটিং স্লটার ইন ইস্ট পাকিস্তান। টাইম্‌স্, লণ্ডন, ৯ জুলাই, ১৯৭১

মাহবুবুল হকঃ বাংলাদেশ ওয়ার অব ইণ্ডিপেন্ডেন্স এণ্ড ইণ্ডিয়া। মেনষ্টীম। ৯(৪৫)। ১০ জুলাই, ১৯৭১

মাহবুবুল হকঃ হোয়াই বাংলাদেশ? 'জার্নাল' ৩(৪)। ১৯৭১। ৬৩৯-৬৬০

মনীন্দ্র ভট্টাচার্যঃ নিউ ডীল ফর বাংলাদেশ। হিন্দুস্তান ষ্ট্যাণ্ডার্ড। ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মুকুট শাহঃ ইকনমিক অ্যাসপেক্টস অব বাংলাদেশ আপহীভাল। য়ুনাইটেড এশিয়া। ২৩(৩)। মে-জুন, ১৯৭১। ১৮১-১৯১

মতিলাল পালঃ দি ইকনমিক ভায়াবিলিটি অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট বাংলাদেশ। 'কোয়েষ্ট' (৭২)। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭১

মতিয়ুর রহমানঃ দি ইকনমি অব ইষ্ট পাকিস্তান। দি পাকিস্তান অবজারভার (ঢাকা)। ১৯ অক্টোবর, ১৯৭০

মাসুদ আহমদঃ বাংলাদেশ এণ্ড ইণ্ডিয়ান মুসলিমস। অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৯ অক্টোবর, ১৯৭১

মোহিত সেনঃ বাংলাদেশ এণ্ড ইণ্ডিয়ান্‌স্ শিফ্‌ট টু দি লেফ্‌ট্। নিউ এজ ১৯(৫২)। ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মঈন শাকিরঃ দি টু ন্যাশন থিওরী। সেকুলার ডেমোক্র্যাসী। ডিসেম্বর, ১৯৭১

যতীন্দ্র ভাটনাগরঃ মুজিব, দি পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফী। ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফী. ইণ্ডিয়ান স্কুল সাপ্লাই, দিল্লী, ১৯৭১

রামেন্দ্র নারায়ণ নাগঃ ইকনমিক এক্সপ্লয়টেশন অব ইষ্ট বেঙ্গল বাই ওয়েষ্ট উইং। অমৃতবাজার পত্রিকা। ১০ মে, ১৯৭১

রিচার্ড ন্যাশন্‌স্ঃ দি ইকনমিক ষ্ট্রাকচার অব পাকিস্তান—ক্লাস এণ্ড কলনী। নিউ লেফট রিভ্যু। জুলাই-আগষ্ট. ১৯৭১

রবি কাউলঃ ষ্ট্রাটেজিক কন্‌সিকোয়েন্সেস অব বাংলাদেশ। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস। ২৯ এপ্রিল ১৯৭১

রথী সোহনীঃ বাংলাদেশ এণ্ড বিয়োণ্ড-পলিসী ফর্মুলেশন। ট্রিব্যুন। ২২ নভেম্বর, ১৯৭১

শিবদাস ব্যানার্জীঃ ফ্যুচার সেটাপ্ অব বাংলাদেশ—পলিসী প্রব্লেম। টাইমস অব ইণ্ডিয়া। ২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

শংকর ঘোষঃ নেক্‌ষ্ট্ রাউণ্ড অভার বাংলাদেশ। হিন্দুস্তান ষ্ট্যাণ্ডার্ড। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

শ্যামলালঃ এ ষ্টাডী ইন কনট্রাষ্ট—ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান অভার টুয়েণ্টি-ফাইভ ইয়ার্‌স্। টাইমস অব ইণ্ডিয়া। ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

শওকত ওসমানঃ বাংলাদেশ এণ্ড দি লেফটিষ্ট্‌স্। নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া পত্রিকা। ৮ অক্টোবর, ১৯৭১

শিব নারায়ণ রায়ঃ বাংলাদেশ এন্ড ইন্ডিয়া। 'কোয়াড্র্যান্ট'। জুলাই/আগষ্ট, ১৯৭১

শিশির গুপ্তঃ ওভার-অপ্টিমিজ্‌ম ইজ সেলফ-ডিফীটিং। মেনষ্ট্রীম। ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

শিশির গুপ্তঃ মিলিটারী-ব্যুরোক্র্যাটিক অলিগার্কী অব পাকিস্তান। ইন্ডিয়ান লেফট রিভ্যু। মে-জুন, ১৯৭১

শিশির গুপ্তঃ ইউ এন কাউন্সিল অ্যাট ইটস ওন গেম—এ প্যারডী অব পীস্ কীপিং রোল। টাইমস অব ইন্ডিয়া। ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

শিশির গুপ্তঃ নিউ ফেস অব সাবকন্টিনেন্ট—হোপস অব বেটার রিজ্যোনাল রিলেশনস। টাইমস অব ইন্ডিয়া। ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

শ্যামলালঃ ইণ্ডিয়াস ইয়ার অব ডিসিশন—এ চেঞ্জড্ ইণ্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট। টাইমস অব ইন্ডিয়া। ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

শ্যামলালঃ দি লিবারেশন এন্ড আফটার—চেঞ্জেস ইন ব্যালেন্স অব পাওয়ার। টাইমস অব ইন্ডিয়া। ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সুনন্দ কুমার রায় দত্তঃ বেঙ্গল—দি কষ্ট্ অব কম্যুন্যালিষ্ট। রেস্ টুডে। ৩(৭); জুলাই, ১৯৭১ঃ ২১৮

সুমিত মিত্রঃ বাংলাদেশ—দি হিষ্ট্রিক্যাল ব্যাকড্রপ। হিন্দুস্তান ষ্ট্যান্ডার্ড। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সুমন্ত ব্যানার্জীঃ মাওয়িষ্ট্‌স্—ড্রুয়িং উইদাউট চায়না? ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলী। ৬ (২৭); ৩ জুলাই, ১৯৭১। ১৩২১-১৩২২

সি. ডি. গোপাল কৃষ্ণনঃ হোয়াট লস অব বাংলাদেশ মে মীন টু পাকিস্তান। হিন্দু। ২৪ এপ্রিল, ১৯৭১

সি,. এস. পন্ডিতঃ শ্যাডো অব ফ্রীডম ফাইটার্স ওভার বাংলাদেশ। সানডে ষ্ট্যান্ডার্ড। ৭ নভেম্বর, ১৯৭১

সেলি রায়ঃ পাকিস্তান, বাংলাদেশ এন্ড ইন্ডিয়া—সাম কমেন্টস অন দি কারেন্ট সিচুয়্যাশন। অষ্ট্রেলিয়া'স নেবারস্। ৪(৭৬); জুলাই-আগষ্ট, ১৯৭১। ৮-১২

সাধন কুমার ঘোষঃ বাংলাদেশ এন্ড দি ওয়ার্ল্ড। অমৃতবাজার পত্রিকা। ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সীতা শ্রেষ্ঠঃ নেপাল এন্ড বাংলাদেশ। হিন্দুস্তান টাইমস। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

হার্বার্ট এপতেখারঃ বাংলাদেশ—এ নিউ নেশন ইজ বর্ণ। মেনষ্ট্রীম; ১০(৯)। ৩০ অক্টোবর, ১৯৭১। ১১-১৪

হোয়াই বাংলাদেশ? ঃগভর্ণমেণ্ট অব বাংলাদেশ। ১৯৭১

হার্জি মালিকঃ ইকনমিক পোটেনশিয়্যাল অব বাংলাদেশ। ষ্টেটসম্যান। ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

হুবার্ট ইভান্সঃ দি ল্যাঙ্গোয়েজ প্রব্লেম ইন মাল্টিন্যাশনাল ষ্টেটস—দি কেস অব ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান। এশিয়ান য়্যাফেয়ার্স। ৫৮(২)। জুন, ১৯৭১। ১৮০-১৮৯

হিরণ্ময় কার্লেকারঃ দি বাংলাদেশ বাংলাদেশ নীড্ টু নার্স ফ্রেণ্ড-বেঙ্গল পলিটিকস। ষ্টেটসম্যান। ১ জানুয়ারী, ১৯৭২

হিরণ্ময় কার্লেকারঃ দি বাংলাদেশ লিবারেশন ইমপেক্ট অন ওয়েষ্ট বেঙ্গল পলিটিকস। স্টেটসম্যান। ১ জানুয়ারী, ১৯৭২

হাবিবুল্লাহঃ দি গ্রেভ টু-নেশন থিওরী। সেকুলার ডেমোক্র্যাসী; ৪(১২)। ডিসেম্বর, ১৯৭১। ৩৯, ৪১

হোমার এ জ্যাকঃ দি ইউনাইটেড ষ্টেটস, ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ। আসাম ট্রিবুন। ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ইউনাইটেড ষ্টেটস এণ্ড দি ইণ্ডো-পাক ওয়ার। ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলী। ৬(৫১)। ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ২৫০৪*

মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর ও পুনর্বিন্যাসঃ দীন মুহম্মদ।

*বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে যেসব গ্রন্থ, নিবন্ধ ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে তারই ভিত্তিতে উপরোক্ত গ্রন্থপঞ্জী সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীটি পূর্ণাঙ্গ নয়। গ্রন্থ, নিবন্ধ ও প্রামাণ্য দলিলের বিস্তারিত তালিকা ৩৩৫, সেগুন বাগিচা, ঢাকা, এ ঠিকানায় বাংলাদেশ সরকারের গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের সোনালী সম্পদ—পাট

লেখক ও শিল্পী পরিচিতিঃ

সৈয়দ আলী আহসানঃ শিক্ষাবিদ, কবি, সমালোচক, গ্রন্থকার। ভাইস-চ্যান্সেলর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়; পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রফেসর এবং অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডক্টর সালাহউদ্দীন আহমদঃ ঐতিহাসিক, গ্রন্থকার। প্রফেসর এবং অধ্যক্ষ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আবদুল গাফফার চৌধুরীঃ ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প লেখক, সাংবাদিক। সংবাদপত্রের নিয়মিত কলামিষ্ট।

দুর্গা প্রসাদ ধরঃ মন্ত্রী, পরিকল্পনা দফতর, ভারত সরকার। প্রাক্তন চেয়ারম্যান, নীতি-নির্ধারণ কমিটি, বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার।

সরদার ফজলুল করিমঃ প্রবন্ধকার, অনুবাদক। অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরঃ ছোট গল্প লেখক, প্রাবন্ধিক, শিল্প সমালোচক। অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীঃ প্রাবন্ধিক, সমালোচক, গ্রন্থকার। অধ্যক্ষ ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নুরুল ইসলাম পাটোয়ারীঃ প্রাবন্ধিক সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক, ছদ্মনাম 'নুইপা' পরিচালক, গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

মোহাম্মদ জমীরঃ লেখক। বর্তমানে বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কার্যরত।

খোন্দকার গোলাম মুস্তাফাঃ যুগ্ম সম্পাদক, 'বাংলাদেশ অবজারভার'; সভাপতি, সংগঠনী কমিটি, বাংলাদেশ সাংবাদিক ফেডারেশন।

মোহাম্মদ আমজাদ হোসেনঃ লেখক। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কার্যরত।

কামরুল হাসানঃ চিত্রশিল্পী। প্রধান ডিজাইনার, ডিজাইন সেন্টার, ঢাকা।

কাইয়ুম চৌধুরীঃ চিত্রশিল্পী। অধ্যাপক, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

রফিকুননবীঃ চিত্রশিল্পী। অধ্যাপক, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

কালাম মাহমুদঃ চিত্রশিল্পী। শিল্প নির্দেশক, দৈনিক বাংলা' প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা।

লুৎফুল হক : শিল্পী, 'দৈনিক বাংলা' প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা।

তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কর্তৃক প্রকাশিত

PP মুদ্রণে পদ্মা প্রিন্টার্স